ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ২১ সংখ্যা ।। ৪ মাঘ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৮ জানুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

জঙ্গি নিশানায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

বিশেষ প্রতিনিধি।। দিল্লীর ডিফেন্স কলেজ নিশানা থেকে ফস্কে যাবার পর লস্কর-এ-তৈবার নয়া 'টার্গেট' এখন দশ ভারতীয় বিজ্ঞানী। লস্করের এই 'মনোবাঞ্ছা' জানার পরেই তাঁদের জন্য জোরদার করা হচ্ছে পুলিশী নিরাপত্তা। ওয়াই ক্যাটাগরির

নিরাপত্তার পাশাপাশি দিন-রাত সর্বক্ষণের পুলিশি প্রহরার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। স্পেস, নিউক্লিয়ার এবং স্পর্শকাতর নিরাপত্তা কলা-কৌশলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের তাদের 'হিটলিস্টে' রেখেছে লস্কর। প্রসঙ্গত গত বছর জুড়ে যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীহানার হুমকি প্রকাশ্যে এসেছিল তা সবগুলোই ছিল আমাদের দেশের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার মতো ঘটনা। গত ২০০৮-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ গোয়েন্দারা 'সমুদ্রপথে আক্রমণ'-এ ('সী-বর্ন-অ্যাটাকস)-এর গন্ধ পেয়েছিলেন। এর পরে ২৬/১১-এর ঘটনার কথা সবাই জানেন। যাই হোক, সমুদ্র উপকূলবর্তী নিরাপত্তা নিয়ে একটি সরকারি এজেন্সি এবং সুরক্ষা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। এর ফলে একটি মারাত্মক তথ্য তাঁদের হাতে আসে। সেই তথ্যে বলা হয় আই এন এস বিভ্রাট এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার রয়েছে আগামীদিনের জঙ্গি নিশানায়।

গত বছরের জুলাই-আগষ্ট মাস নাগাদ সরকারের হাতে বেশ কিছু গোপন তথ্য আসে যে প্রাথমিকভাবে ভারতের নিরাপত্তা ও স্পর্শকাতর বিষয়ে ৩৪টি স্থানকে 'টার্গেট'

(এরপর ৪পাতায়)

জ্যোতিবাবু 'লগনচাঁদা' নেতা

সংবাদমাধ্যমে লাগামছাড়া উন্মাদনা

।। গুঢ়পুরুষ ।। অসুস্থ জ্যোতি বসুর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমে যে অভূতপূর্ব প্রচারের বাদ্য প্রতিদিন অবিরাম বেজে চলেছে তা নিঃসন্দেহে অরুচিকর। জ্যোতিবাবুর বয়স ৯৬ বছর। আগামী ৮ জুলাই তাঁর ৯৬ বছর বয়স পূর্ণ হবে। এমন একজন অতি বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের এমন খোঁচাখুঁচি কতটা উচিৎ তা একবার ভেবে দেখা দরকার। এই প্রতিবেদন লেখার সময় জ্যোতিবাবুর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক হলেও স্থিতিশীল। তাই কলকাতার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক বন্ধুদের এবং তাঁদের পরিচালকদের কয়েকটি 'তিক্ত সত্য' কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কোনও মানুষই অমর নয়। প্রচারের ঢক্কা নিনাদেও গুরুতর অসুস্থ ৯৬ বছরের বৃদ্ধ জ্যোতিবাবুকে অমর করতে পারে না। পরিণত বয়সে মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা। শুধু কোনও ব্যক্তির পরিণত বয়সেও চির বিদায় আমাদের দুঃখ দেয়। তার বেশি কিছু নয়।

অজয় মুখার্জী

জ্যোতি বসু

প্রফুল্ল সেন

জ্যোতি বসু আক্ষরিক অর্থেই সোনার চামচ মুখে দিয়েই জন্মেছিলেন। অতি উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান বিলেতে লেখাপড়া করতে গিয়ে কম্যুনিস্ট হন। কারণ, সেটাই তখন বিলেতে থাকা বিত্তবান পরিবারের ছেলেমেয়েদের ফ্যাশন বা যুগধর্ম ছিল। কথায় কথায় লেনিন, স্তালিন, মার্কস আওড়াতে পারলে উচ্চবিত্ত সমাজে আঁতেল বলে তখন সমীহ আদায় করা যেত। জ্যোতিবাবু মোটেই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিলেত থেকে ফিরে চল্লিশের দশকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন শ্রমিক মজদুরদের সঙ্গে গা ঘামিয়ে নয়। বড়লোকের শৌখিন সন্তানের মতো। রেলের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন রেলের পরিচালকদের দেওয়া প্রথম শ্রেণীর ফ্রি পাসে ভ্রমণ করে। জ্যোতিবাবুই প্রথম সর্বহারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যাঁকে রেল সারা ভারত ভ্রমণের জন্য সে যুগের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ফ্রি পাস বছর বছর দিয়েছে। জ্যোতিবাবু যখন প্রথম কম্যুনিস্ট বিধায়ক হন তখন কলকতার জনৈক ধনী ব্যবসায়ী তাঁকে ভালবেসে শ্রদ্ধা জানিয়ে আনকোরা একটি দামি গাড়ি উপহার দেন। হ্যাঁ, জন্ম থেকেই জ্যোতিবাবু এতটাই ভাগ্যবান। যাকে কথ্যভাষায় লগনচাঁদা বলে।

(এরপর ৪পাতায়)

২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সঙ্গত কারণেই জ্যোতি বসুর জন্য আজ রাজ্যের মানুষের তেমন হাহুতাশ নেই। তার প্রধান কারণ, ২৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকে রেকর্ড করা এই 'মহান নেতা' ছেলে চন্দন ছাড়া আর কারও জন্য বিশেষ কিছু করে যাননি। তাঁর আমলেই পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে গিয়েছে। ঠিক এই সময়ে জ্যোতি বসুর এমন মূল্যায়ণ নিয়ে হয়তো তির্যক প্রশ্ন উঠতে পারে। বামপন্থী তাই ধর্মে বিশ্বাস করতেন না বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন মুহূর্তে নিন্দামন্দ হিন্দুরীতি অনুযায়ী সঠিক নয় বলে হয়তো অনেকে মত প্রকাশ করবেন। এই সময়ে আমাদের 'ধর্ম' হওয়া উচিত তাঁকে মহান প্রতিপন্ন করা। চূড়ান্ত অধর্মীয় এক বাস্তববাদী প্রগতিশীলের জন্য বোধহয় এই আফিম মিশ্রিত সৌজন্য না থাকাই উচিত। তাই সঙ্গত কারণেই জ্যোতি বসুর জন্য আজ রাজ্যবাসীর কোনও হাপিত্যেশ নেই। কতিপয় সিপিএম নেতা আর পুত্র চন্দন বসু ছাড়া কারই বা কি এসে গেল? গত এক বছর তিনি পাবলিক লাইফ থেকে দূরে। তবে যতদিন রাজ্যের ক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং তার স্বাদ শুষে আস্বাদ করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গ ছিবড়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁরই তাড়নায় আজ রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সুখভোগও শেষ হতে চলেছে। নিজেকে বামপন্থী নেতা নন, দেশের রাজাধিরাজ ভাবতেন বোধ হয়। সেই ঔদ্ধত্যের জায়গা থেকেই কেন্দ্রে বিজেপি'কে অসভ্য-বর্বরদের সরকার ও দল বলেছিলেন। যে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিল সেই তাদেরই ঘুরিয়ে অসভ্য-বর্বর বলেছিলেন তিনি। ক্ষমতায় টিকে থাকতে ১৯৮৯ সালে বাজপেয়ীর হাত ধরে ছবি তুলতে অবশ্য তাঁর দ্বিধা হয়নি। আর কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর তার উপর চাপ বেড়েছিল। তাই অমন কথা বলেছিলেন। প্রকৃত নেতা বাজপেয়ী-আদবানী তা গায়ে মাখেননি। আসলে টাইট দিতে পারতেন। ভদ্রতাবোধ ছিল বলে বহু মন্ত্রিসভার সদস্যই মনে করতে পারেন না। তাঁদেরও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন। ক্ষমতা ভোগ করার জন্য অবশ্য বিজেপি আমলেও কেন্দ্রের কাছে হাত পাততে সংকোচ করেননি। আজ মূল্যায়ণ হওয়া দরকার জ্যোতি বসু

(এরপর ৪পাতায়)

এই সংখ্যায়

হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তেজস্ক্রিয় দূষণের সূতিকাগার...৮
বাংলাদেশ কি কলকাতা-কোচবিহার সোজা রাস্তা খুলে দেবে ৬
আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে বিহারও প্রথম সারিতে উঠে এল.....৭
সংখ্যালঘু তোষণের বিষময় ফল..১০
সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা ১১

জঙ্গলমহলে অরন্ধন

যৌথবাহিনী পরোক্ষে মাওবাদীদেরই মদত দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু বলছেন, মাওবাদী নেতা কিষেণজীকে ধরা কঠিন। আর ঠিক তারপরই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অর্দ্ধেন্দু সেন বলছেন, কিষেণজীকে ধরা হবে। এতে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। একইরকমভাবে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের নানারকম প্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। একবার বলা হচ্ছে, কিষেণজীকে বাংলা ছাড়তে হয়েছে দলের চাপে। আর তারপরদিনই কিষেণজী মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল থেকে সংবাদমাধ্যমে বার্তা পাঠাচ্ছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত খবরে দেখা যাচ্ছে , কিষেণজী নিজের জায়গাতেই বহাল তবিয়তে আছেন। সংগঠনের বিস্তারে এবং ব্যাপক জনসমর্থন জোগাড়ে জোর দিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের নানা কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে।

যেমনটা হয়েছে গত ৭ জানুয়ারি। সেদিন সারা জঙ্গলমহলে অরন্ধন পালিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে। খোদ ঝাড়গ্রাম শহরেও অনেক এলাকাতে হয়েছে অরন্ধন। গ্রামে অরন্ধন আর জেলে অনশন। অরন্ধন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মাওবাদীদের ভিত্তি বাড়ানোই লক্ষ্য। তা সে স্বেচ্ছাতেই হোক আর ভয়েই হোক। মাওবাদীরা এখন রান্নাঘর-কে নিজেদের আন্দোলনের আওতায় টেনে আনতে চাইছে অর্থাৎ গ্রাম-গঞ্জের মা-বোনেদেরও চাপে রাখল। একদিকে গ্রামের মহিলাদের দিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ আর অন্যদিকে পীপুলস্ গেরিলা আর্মির সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা।

অন্যদিকে যৌথবাহিনীর কাজ-কারবারও এমন যে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মাওবাদীদের সমর্থক হয়ে যাচ্ছে। লালগড়ের প্রায় তিনদিকেই জঙ্গল। ওখানে মাওবাদীরা গত ৬ জানুয়ারি ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই শব্দবাজির মতো জোরালো বিস্ফোরণ ঘটায়। তৎক্ষণাৎ যৌথবাহিনী 'মাও' ধরতে বেরিয়ে পড়ে। লালগড়ের সাপ্তাহিক হাট ফেরৎ কিছু নির্বিরোধী যুবক লালগড়ের চালকপাড়াতে এক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাদেরকে ধরে বেধড়ক মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে লকআপ-এ ভরে দেয়। পরদিন ইস্যু হাতে পেয়েই জনগণের কমিটি মাঠে নামে।

(এরপর ৪পাতায়)

স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৮তম জন্মদিন উপলক্ষে শোভাযাত্রা। পেছনে স্বামীজীর বাড়ি। –ছবি ঃ বাসুদেব পাল

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মানুষের ভুলেই বাড়ছে রেল দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৬ থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি একই দিনে উত্তর ভারতে তিনটি ট্রেন দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হলো। এবছরেই ২ জানুয়ারি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মানুষই। মানুষের ভুলেই দুর্ঘটনা। গত তিন বছরে ৬৫০টি ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা ঘটেছে। ওই সব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৭৩০, আহত ১৪০০ জন। রেলেরই এক সমীক্ষা মোতাবেক ২৮০টি ঘটনা ঘটেছে মানুষের ভুলে—রেলের কর্মীদের ভুলেই। তারা সবাই রেলের স্টাফ্। ৩৪টি দুর্ঘটনা অন্তর্ঘাতের জন্য আর ২০টি দুর্ঘটনার কারণ যান্ত্রিক গোলযোগ। এরকমই সমীক্ষার রিপোর্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রে রেলের পরিচালন ব্যবস্থা বা কর্মী নন, বাহ্যিক কোনও কারণ দায়ী।

২০০৬-০৭ এবং ২০০৮-০৯-এ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার জন্য ২০৭ জন রেলকর্মীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতি বা অবহেলার জন্য ৩০৩ জন রেলকর্মীকে অল্প-স্বল্প শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। এইসব শাস্তি-প্রদানের ঘটনা ঘটেছে গত বছরের (২০০৯) এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। বড় ধরনের শাস্তি হয়েছে চল্লিশ জনের এবং ছোট-খাটো শাস্তি হয়েছে ৫৪ জন রেল-কর্মীর ক্ষেত্রে। রেলমন্ত্রকের জনৈক অফিসার এসকল তথ্য জানিয়েছেন।

২০০৬-০৮ এর মধ্যে রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৮৪ টি এবং ২০০৮-২০০৯-এর মধ্যে ১৭৭ টি ট্রেন-দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর—এই ছয়মাসে রেল-দুর্ঘটনা ঘটেছে ৮৪টি। তার ফলে ভারতীয় রেলের ১৩৩ কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে আর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি টাকা।

রেলমন্ত্রকের পদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন রেল-দুর্ঘটনার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনতে অনেকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সেফটি ডিভাইস লাগানো, ট্রেনরক্ষাকারী নিরাপত্তা-ঘণ্টা, দুটি ট্রেনের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ বিরোধী যন্ত্র (অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস), ব্লক প্রোভিং অ্যাকসেল কাউন্টার, সহায়ক সাবধানতা গ্রহণ, এল ই ডি সিগন্যাল, ভিজিল্যান্স কন্ট্রোল ডিভাইস প্রভৃতি। এছাড়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রেল কর্মচারীদের নানারকম প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে রেলদপ্তর। তাতে যান্ত্রিক ও অন্যান্য খুঁটিনাটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো যায়। এছাড়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সামগ্রিক পরিকাঠামোরও উন্নয়ন করা হবে বলে জানা গেছে। তবে এতাবৎ দুটি ট্রেনের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ-বিরোধী ব্যবস্থা (অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস) লাগানোর ক্ষেত্রে কাজ সামান্যই এগিয়েছে। কেননা এবছরের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশে একটি ট্রেন অন্য একটি ট্রেনকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে ক'দিন আগেই। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন রেল ডিভিশন এই ডিভাইস-প্রযুক্তি (Anti Collission Divice) উদ্ভাবন করেছে। ২০০০-০১ সালে উত্তর সীমান্ত রেল এই ACD ডিভাইস সম্পর্কিত পাইলট প্রজেক্ট অনুমোদন করেছিল। উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত রেলের ১,৭৩৬ কিমি রেলপথে ২০০৬-এর জুলাই মাসে লাগানো হয়েছিল।

একনজরে দুর্ঘটনা

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
মৃত	২০৮	১৯১	২০৯	১২৩
আহত	৪০২	৪১২	৪৪৩	১৫৫
ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)	৫০০.৮৯	১২১.৩৭	২১৮.৯৪	২৬৭.৫৬
রেলের ক্ষতি (লক্ষ টাকায়)	৩১৯৩.০	৪০৫৫.৪০	৫৮৫২.৩৭	২৭৬.৪৬

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ওই ডিভাইসে (ACD) আর কিছু রদবদল করে কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করার জন্য আবার কোঙ্কন রেলকে ফেরৎ দিয়েছে। এই সংশোধিত ডিভাইস (ACD) দক্ষিণ, দক্ষিণ মধ্য এবং দক্ষিণ পশ্চিম রেলের ১৬০০ কিমি রেলপথে লাগানো হবে। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে নতুন পরিমার্জিত ডিভাইস (ACD) পরীক্ষামূলকভাবে লাগিয়ে দেখার পর আবার নতুন চিন্তা ভাবনা করা হবে।

এই সময়

উলফা ও মুশারফ

বাংলাদেশের মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত-ভ্রমণের প্রাক্কালে চাঞ্চ ল্যকর মন্তব্য করলেন। আশরাফুল বলেছেন—পাকিস্তান বাংলাদেশের মাটিকে বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে এসেছে। যেমন পারভেজ মুশারফ পাক-প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন বাংলাদেশের একটি হোটেলে বি এন পি-জামাতের আমলে উলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার সঙ্গে বৈঠক হয় মুশারফের। বলাই বাহুল্য, ভারত বিরোধিতার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয় সেখানেই।

মৃত্যু নয়, হত্যা

মোটেই মৃত্যু হয়নি পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের। তাঁকে বরং হত্যা করা হয়েছে। এমনই চাঞ্চ ল্যকর দাবী করল একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র, নিউজ অব্ দি ওয়ার্ল্ড। গত ১০ই জানুয়ারি ওই সংবাদপত্রটি তাদের একটি প্রতিবেদনে লস্ অ্যাঞ্জেলস-এর সন্দেহজনক মৃত্যুর তদন্তকারী (করোনার)-দের উদ্ধৃত করে দাবী করে, এ ব্যাপারে যাবতীয় নথি-পত্রের আসল (অরিজিনাল) তাদের হাতে এসেছে। জানা গেছে গত ৭ই জুলাই মাইকেলের মৃত্যুর পর যে 'ডেথ সার্টিফিকেট' ইস্যু করা হয় তাতে সন্দেহজনক মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্ত বিভাগের মুখ্য তদন্তকারী কার্ল ম্যাক হোয়াইল মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেননি। এটি সংশোধন করে ৩১ তারিখে মাইকেলের দেহ-পরীক্ষক ক্রিস্টোফার রজার তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'নরহত্যা' (হোমিসাইড)-র কথা উল্লেখ করেন।

কী গেরো!

একদিকে কবীর সুমন, অন্যদিকে শশী থারুর। এই দুজনকে নিয়ে কি ভয়ানক ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছেন তাঁদের দলনেত্রীরা। দু'জনের মুখে আর কিছুতেই লাগাম পরানো যাচ্ছে না। মমতা দিদিকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে সুমন গাইছেন ছত্রধরের প্রশস্তিভরা গান। আর শশী সোনিয়া ম্যাডামকে যারপরনাই বিব্রত করে মুখর হয়েছেন নেহেরুর বিদেশনীতির সমালোচনায়। শশীকে যাও বা 'দাদা'-দের (পড়ুন প্রণব, কৃষ্ণ) দিয়ে ধমক-টমক দিয়ে বাগে আনতে পেরেছেন সোনিয়া, কিন্তু হুঙ্কার ছেড়েও সুমনকে তেমনটি মোটেই করতে পারছেন না মমতা।

অজি শয়তানী

যে দেশের জাতীয় প্রতীক ক্যাঙারুর মতো একটি নিরীহ প্রাণী, সেদেশের অধিবাসীরা এত হিংস্র, অমানবিক ও শয়তান হয় কি করে তা বোধহয় ভগবানই জানেন। নীতিন গর্গকে অষ্ট্রেলিয়ান খুনেরা মেরেছিল আগেই। সেটা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে যেতেই, হাঁ হাঁ করে তেড়ে এসেছিল সেদেশের রাজনীতিবিদরা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই গত ৯ই জানুয়ারি ২৯ বছর বয়সী এক পাঞ্জাবী যুবকের গায়ে মেলবোর্নের শহরতলী ইসেনডনে আগুন লাগিয়ে দেয় চার অস্ট্রেলীয়। এর সাফাই দিতে গিয়ে অজি-পুলিশ মন্তব্য করেছে—তাদের বিশ্বাস কোনও জাতিগত উদ্দেশ্যে (রেসিক্যালি মোটিভেটেড) এই হামলা সংগঠিত হয়নি। তাদের এহেন বিশ্বাসের কারণ নাকি—'পারিপার্শ্বিক অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী'!

ছিঃ, দেবেগৌড়া

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তিনি এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন যে মুখের ভাষাও আর বাঁধ মানছে না। তিনি হলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া। কয়েকদিন আগে তিনি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার সম্পর্কে তাঁর পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করে দিয়ে ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। শোভা কারাণ্ডলাজের ঘটনায় নারী-কেলেঙ্কারীতে নাম জড়িয়ে কর্ণাটকী মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে অকথ্য ভাষায় গালাগালও দেন তিনি। জবাবে ইয়েদুরাপ্পার প্রতিক্রিয়া—'মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন দেবেগৌড়া।'

অহো! কী বুদ্ধি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কে আর কিছু থাকুক ছাই না থাকুক সকলেই এটা মানবেন যে তাঁর মাথায় কূটবুদ্ধি (কেতাবী ভাষায় এরই নাম বোধহয় কূটনীতি) যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। বেছে বেছে উনি ২০১০-১১ সালের বাজেট ঘোষণার ফন্দী এঁটেছেন আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারি। গত ৯ই জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তেমনই ঈঙ্গিত পেলেন সাংবাদিকরা। ২৭শে ফেব্রুয়ারি মহাত্মাদের জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্রিয় সরকারি ছুটি তো রয়েইছে উপরন্তু ২৮ তারিখ রয়েছে রোববার। প্রণববাবুর প্রথম উদ্দেশ্য, 'পয়গম্বরে'র জন্মদিবসের প্রাক্কালে বাজেটের মাধ্যমে তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের কিছু বকশিস দেওয়া (মানে তথাকথিত সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা)। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বিলগ্নীকরণ সহ যাবতীয় কঠিন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়াটা বাজেট পরবর্তী দিন-দুয়ের ছুটিতে বুঝে নিয়ে, ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

সমর শিক্ষায় ললনা-রা

সমর শিক্ষায় ক্রমশ আগ্রহী হচ্ছেন মেয়েরা। গত ৯ই জানুয়ারি জাতীয় সমর শিক্ষাবাহিনী (ন্যাশনাল ক্যাডেট কপস বা এন সি সি) একটি ঘোষণায় বলে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এখন তাদের মহিলা ক্যাডেটের সংখ্যা ৫০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। আগে এই সংখ্যাটাই ছিল মাত্র ২৩ শতাংশ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শেখ হাসিনার ভারত সফর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরকে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সাফল্যফলক হিসাবে চিহ্নিত করা হইতেছে। সন্দেহ নাই, ভারত-বাংলাদেশের উন্নত সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করিবে। ঘটনা হইল, গত চার দশক ধরিয়া দুই দেশের সম্পর্ক নানাবিধ সংশয়-শত্রুতার আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে। প্রায় দুই কোটি বাংলাদেশী ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়িয়া ভারতে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাইয়াছে। বাংলাদেশে যে জঙ্গিদের আঁতুড়-ঘর তাহা কোনও গোপন ব্যাপার নয়। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর লোকেরা যে বাংলাদেশ হইয়াই ভারতে ঢুকিয়া নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাইয়াছে, ইহাও সুবিদিত। এদেশে চলিয়া আসা হিন্দুদের সম্পত্তিকে সেদেশের সরকার শত্রুসম্পত্তি ঘোষণা করিয়াছে, ইহাও সকলের জানা। বাংলাদেশ ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্ম (স্টেট রিলিজিয়ন) হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে। সর্বোপরি একটি বৃহত্তর বাংলাদেশ বা মোঘলস্থান গড়িবার নকশাকে কার্যকর করিবার গোপন প্রয়াস যে অব্যাহত, সংবাদমাধ্যমে ইতিপূর্বেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এককথায়, তীব্র ভারত বিরোধিতাই যেন বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল অথচ বাংলাদেশের জন্মলগ্ন হইতে ভারত যেভাবে স্বনিযুক্ত ধাত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ কৃতঘ্নতা কোনওভাবেই প্রত্যাশা করে নাই।

শেখ হাসিনার এই সফরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত পাঁচটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই পাঁচটি চুক্তি হইল—অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান, বন্দি প্রত্যর্পণ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধ সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের বিরোধিতা, বিদ্যুৎশক্তি-সংক্রান্ত বোঝাপড়া এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতি। তিনটি বিতর্কিত বিষয়—জলবণ্টন, চোরাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস দমন—এইবার দুই রাষ্ট্রীয় বোঝাপড়ার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহা অবশ্য আশাব্যঞ্জক। নয়াদিল্লী দীর্ঘলাভ ও মিত্রতার প্রত্যাশায় এইবারে যে অভূতপূর্ব সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা দরাজ সাহায্য দিয়াছে, তাহা এককথায় অভূতপূর্ব। বস্তুত, এই পরিমাণ এককালীন অর্থ সাহায্য ভারত আর কখনওই কোনও দেশকে দেয় নাই।

ভারতের সহায়তা এখানেই থামিয়া যায় নাই। নেপাল ও ভূটানে 'ট্রানজিটে'র জন্য বাংলাদেশকে ভারত তার ভূখণ্ড ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারত যেভাবে সংবর্ধনা জানাইয়াছে, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তার কথা ঘোষণা করিয়াছে, বিপরীতদিকে বাংলাদেশ হইতে তেমন কিছু সুবিধা আদায় করিতে পারে নাই। হাসিনার সফরে যেমন কলকাতা নাই, তেমনই বাংলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও নাই। যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে এক ভাষাগোষ্ঠী হওয়ার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্পর্ক গভীর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ইলিশ মাছ, শাড়ী, গানবাজনা ও সাহিত্যের মতো খানিকটা আবেগতাড়িত প্রসঙ্গগুলির মধ্যেই তাহা সীমিত। বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী এবং তাহা লইয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর কতটা ভাবনা-চিন্তা করার দরকার, এই বোধটা আমাদের অনেকেরই নাই।

আমরা বাংলাদেশকে নেপালে ও ভূটানে যাইবার পথ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু কলিকাতা হইতে কোচবিহার যাওয়ার সোজা পথটি বাংলাদেশ খুলিয়া দিবে কি? কিংবা জলপাইগুড়ি-রায়গঞ্জ, কলকাতা-শিলচর কিংবা কলকাতা-আগরতলা? বাংলাদেশ যদি নিজেদের ভূখণ্ড আমাদের ব্যবহারের অনুমতি দেয় তবে কলকাতা হইতে আগরতলা ও শিলচরের দূরত্ব দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৪৩০ ও ৬২০ কিলোমিটার। এখন যাহা যথাক্রমে ১৬২৯ এবং ১৩৭৮ কিলোমিটার।

প্রতিটি দেশই জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকাইয়াই নিজেদের বিদেশনীতি স্থির করে। যে বাংলাদেশের ভূমিসীমান্ত রেখার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ভারতের সঙ্গে, সেই বাংলাদেশে আজ ভারত-বিরোধিতা আর দেশপ্রেম সমার্থক। ইহা অপেক্ষাও দুঃখজনক বিষয় কমই হইতে পারে। যে এক কোটির উপর হিন্দু এখনও বাংলাদেশে আছেন, তাহাদের উপর সময় সময় অত্যাচার হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন আনিবার জন্য ভারতকে যত্ন লইতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

...এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কাল স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভূজে প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া আনি। এস অন্ধকারে ভয় কী? ওই যে নক্ষত্র সকলমধ্যে উঠিতেছে, নিভিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্রতাড়িত, মথিত ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কী নাহয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কী? আইস প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া স্বকীর্তি খড়্গ মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার, ঢাকি ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে। কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, না-কাড়ায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধূম পড়িয়া যাইবে। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচিমণ্ডার লোভে বঙ্গ পূজায় আসিয়া পাত পাড়িবে—কত দেশী-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে। কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়ককে মঙ্গল গাইবে। কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বসমস্যা ও ভারতের দায়

হরনাথ মণ্ডল

উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত—সংলগ্ন একটি অখ্যাত গ্রামের ৯৫ শতাংশ লোক খবরের কাগজ পড়েন না, বিশ্ব উষ্ণায়নের অর্থ এবং তত্ত্ব কি তা জানেন না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে তাঁরা মেঘ দেখে ভীষণ ভয় পেতে শিখেছেন। কালো মেঘ দেখলেই তাঁরা মাঠ থেকে পড়ি কি মরি করে যে যেখানে পারেন ছোটেন, ঝড় বৃষ্টির ভয়ে নয়, বাজ (বজ্রপাত) পড়ার ভয়ে। 'বাজ পড়ার ভাগটা যেন বড্ড বেশি হয়েছে'—গ্রামের মানুষের মুখের এই বাক্যটি এখন একটি আপ্ত বাক্য। কারণ এখন মেঘ করলেই বজ্রপাত। মেঘ সরে গেলে কোথাও না কোথাও থেকে বজ্রপাতের ফলে জীবন, খেতের ফসল বা বৃক্ষাদি হানির সংবাদ আসবেই। কথার শেষ এখানেই নয়। গত ৫-৬ বছর ধরে সবাই আমন ধানের পাতা (ধান গাছের চারা তৈরির জন্য ধান বুনা) ফেলছেন নাবি (দেরি) করে। কারণ সবাই বুঝে গেছেন—'বাদলা (বর্ষা) আরম্ভ হবে সেই দেরি করে, এত আগে আগে চারা ফেলে কি লাভ।' সবশেষে সূর্য রশ্মির রঙের পরিবর্তন আর রোদের তেজ ও তাপ দেখে গ্রামে প্রৌঢ় মানুষের মুখে মুখে বড় বেশি করে ফিরছে এখন একটি লোকবচন—'কলিকালে সূর্যের দশ মুখ হবে'।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' জার্নালে ঠিক এমনই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশেও। এখানে এখন বদলে যাচ্ছে স্বাভাবিক ঋতুচক্র এবং এসব ধীরে ধীরে ঘটে যাচ্ছে আজ ২০ বছর ধরে। গ্রীষ্মের সময়কালও অনেকখানিই বেড়ে গেছে। গ্রীষ্মে একদিকে তীব্র খরা, আবার বর্ষায় প্রবল বন্যা, কালবৈশাখী ও মৌসুমী বায়ুর ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত। নিম্নচাপ ছাড়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি নেই বললেই চলে। একদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় তুলনামূলকভাবে বৃষ্টি কমে গেছে অন্যদিকে রাজস্থানের মরুভূমি ও গুজরাটের কচ্ছে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষের জাতীয় ও জনজীবনে জলবায়ুর এই পরিবর্তন এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। অথচ এ বিষয়ে বিশ্বের মানুষকে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই সাবধান করে দিয়েছেন। এই সাবধানতার অর্ধশতকেরও বেশি সময় পেরিয়ে আজ আমরা বিশ্বের কোণে কোণে সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত বিপর্যয়ের মুখোমুখি। যদিও এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, তবুও আমরা এখন দেখে নিতে পারি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তন কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের ছুষ্ঠটুখগ্ন হিসেবে ভারতে ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত এবং এঁদের সিংহভাগই নিম্ন আয়সম্পন্ন চাষী। চাষের জন্য যাঁদের বৃষ্টি ও ভূগর্ভস্থ জলের উপরই নির্ভরশীল থাকতে হয়। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ণ দপ্তরের নির্দেশক কেভিন ওয়াটকিন্‌স জানাচ্ছেন, শুধুমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নেমে যাবার ফলে ভারতে এই সমস্ত কৃষকের উৎপাদন কমে যাবে ২০ শতাংশ। 'এফ.এ.ও'-এর একটি প্রকল্পে দেখানো হয়েছে ভারতে শুধুমাত্র জলবায়ুর পরিবর্তনে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাবে ১৮ শতাংশ, পরিমাণের দিক দিয়ে যা ১২৫ মিলিয়ন টন। এবং এর প্রতিফলন ঘটবে খাদ্যশস্যের জোগান ও কৃষি কাজের উপর। এবার দেখা যাক জলের বিষয়টি। দিল্লী জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ ইকবাল ২০০২ সালের জুলাই মাসে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কুমেরুর মতো আমাদের হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহগুলিও গলতে শুরু করেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বতন মুখ্য অর্থনীতিক স্যার নিকোলাস স্ট্যার্নের ২০০৬ 'দ্য স্টার্ন রিভিউ' পত্রিকায় দেখানো হয়েছে হিমালয়ের হিমবাহগুলি এত দ্রুত গলছে যে ভারতবর্ষের ৮৫ শতাংশ নদী প্লাবিত হতে হতে ২০৫০ সালের নদীগুলির গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে কলকাতা, মুম্বাইয়ের মতো উপকূলবর্তী

> **"কালো মেঘ দেখলেই তাঁরা মাঠ থেকে পড়ি কি মরি করে যে যেখানে পারেন ছোটেন, ঝড় বৃষ্টির ভয়ে নয়, বাজ (বজ্রপাত) পড়ার ভয়ে। 'বাজ পড়ার ভাগটা যেন বড্ড বেশি হয়েছে'—গ্রামের মানুষের মুখের এই বাক্যটি এখন একটি আপ্ত বাক্য। কারণ এখন মেঘ করলেই বজ্রপাত। মেঘ সরে গেলে কোথাও না কোথাও থেকে বজ্রপাতের ফলে জীবন, খেতের ফসল বা বৃক্ষাদি হানির সংবাদ আসবেই।"**

বাণিজ্য অঞ্চলগুলি শুধু প্লাবিত হবে তাই নয় সেখানকার মিষ্টি জলের আধারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সি. আই.এ এবং বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক যৌথ বিবৃতিতে সাবধান করে দিয়ে বলছে, আগামী দিনে বিশ্বে জল নিয়ে যুদ্ধ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠবে এবং বিশেষত কাশ্মীরের নদীগুলি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের এরকম একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ভারতের সঙ্গে এরকম আরও সমস্যা হবে ফরাক্কা নিয়ে বাংলাদেশ এবং মহাকালী নদী নিয়ে নেপালের সঙ্গেও। শুধু তাই নয়, উপকূলবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হবার কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঘটবে বিপুল সংখ্যক পরিবেশগত অনুপ্রবেশ। মানবিকতার কারণে ভারতবর্ষের কাছে এ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চাপ হয়ে দেখা দেবে। ২০০০ সালে বন্যার সময়কালে আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টা লক্ষ্যও করেছি।

জলবায়ুর পরিবর্তন স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও প্রভাবিত করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে গড়ে ১ ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়লে বিশ্বে প্রায় ৩ লাখ লোক মারা যেতে পারে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ।

জৈব বৈচিত্র্যের উপরেও একটা বড় আঘাত হানছে এই জলবায়ুর পরিবর্তন। ব্যাঙ জাতীয় উভচর প্রাণীদের ত্বকের বিভিন্ন রোগের ফলে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক ধরনের যাযাবর পাখিদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানান প্রজাতির মাছ বিরল হয়ে উঠেছে বা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। সুন্দরবনের নদীতেও মাছ কমছে। সুন্দরবনের গভীর বনে সুন্দরী গাছের সংখ্যা কমে ঝাঁট গরানের মত ঝোপঝাড়ের প্রাধান্য বাড়ছে। দক্ষিণবঙ্গে চাষের ক্ষেত্রে বাড়ছে নাম না জানা নানান আগাছা যা ফসলেরও মারাত্মক ক্ষতি করছে। এবং এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক ভোগবাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে আমাদের মুক্ত করে 'সংরক্ষণাত্মক উন্নয়ন' (Sustainable Develop-ment) এর পথ খোঁজ করা। 'গ্রীন পীস' (Green Peace) নামের সংস্থা ভারতবর্ষের ৮১৯টি পরিবারের গার্হস্থ্য ব্যবহার্য কিছু বৈদ্যুতিক সামগ্রী (আলো, পাখা, গিজার, টিভি, ওয়াশিং মেসিন, এসি ইত্যাদি) যা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরিত হতে পারে তার একটা সমীক্ষা করেছিল। সেই সমীক্ষায় দেখা গেছে মাসিক তিন হাজার বা তার কম আয় সম্পন্ন লোকেরা বছরে যেখানে ১৯৮ কি.গ্রা. কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশাচ্ছে সেখানে ত্রিশ হাজার বা তার বেশি আয় সম্পন্ন লোকেরা মেশাচ্ছে ১০৯১ কিগ্রা।

এই বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার অন্যতম উপায়—(এক) শক্তির চাহিদা কমানো, (দুই) জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে আমাদের বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত থোরিয়ামকে ব্যবহার করা এবং (তিন) কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ার আগেই তাকে সংগ্রহ করে এমনভাবে ভূগর্ভস্থ করা যেন তা আর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে না পারে। কারণ ১৯৯৬ সাল থেকে নরওয়েতে এই পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। চলছে কানাডা এবং আলজেরিয়ায়। আর বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী ও অস্ট্রেলিয়া।

সুতরাং এইভাবে যদি আমরা ব্যক্তিগত স্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগের মাত্রা কমিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন বিকল্পপথ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তবে আমরা আমাদের প্রকৃতিকে আবার আগের মত স্বাভাবিক ছন্দে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে না পারলেও এখনও অনাগত দীর্ঘ সময় পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষ করে নিতে পারি। লক্ষাধিক বছর আগেও যদি পশ্চিম এন্টার্কটিকার তাপমাত্রা ৭-১০ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, ঋক্‌বেদের যুগের আট ঋতু থেকে যদি আমরা ক্রমে ছয় ঋতুতে বেঁচে থাকতে পারি, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেই হবে। এজন্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য অবশ্যই আমাদের 'সংরক্ষণাত্মক' ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে। আর এজন্য চাই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি যাতে পৃথিবীর প্রত্যেক কোণে কোণে মানুষ বুঝতে পারেন প্রকৃতির উপর মানুষের অবিমৃষ্যকারী ক্রিয়াকর্মের ফল প্রকৃতি মানুষপত্রে সব সময় ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। তবে এই দায়বদ্ধতা শুধু ভারতের একার নয়;বিশ্ব সমস্যায় এ তার অংশ গ্রহণের দায়মাত্র।

(সৌজন্যে ঃ ভাবনা-চিন্তা)

সংবাদ মাধ্যমে লাগামছাড়া উন্মাদনা

(১ পাতার পর)

তাই তাঁর শারীরিক অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমে এমন লাগামছাড়া উন্মাদনা দেখে অবাক হবার কিছু নেই। ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীও যে প্রচার পাননি, একটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু তা পেয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে তিনি রাতারাতি 'অতি মানব' হয়েছেন।

অথচ জ্যোতিবাবু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে মোটেই অতি মানব ছিলেন না। তিনি প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পান প্রয়াত বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে মহাকরণে ঢুকে। অজয়বাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় জ্যোতিবাবু ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী। যুক্তফ্রন্ট দু'দফায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিল। প্রথমবার ১৯৬৭ সালের ১৫ মার্চ। দ্বিতীয় দফায় ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। অজয়বাবুর সৌজন্যেই সেদিন জ্যোতিবাবু এবং তাঁর পার্টি সিপিএম মহাকরণ চিনেছিল। পরে সেই অজয়বাবুকে উদ্ধার করা হয় দক্ষিণ কলকাতার ফুটপাতে মৃতপ্রায় অবস্থায়। জনমতের চাপে তাঁকে রাখা হয় এস এস কে এম হাসপাতালের উডবার্ন বিভাগের একটি ঘরে। জ্যোতিবাবু নিজে কোনওদিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যাননি। আরোগ্য কামনা করে ফুল পাঠিয়েছেন এমন কথাও কেউ বলেনি। কারণ, তখন জ্যোতিবাবু একটা কথা তাঁর দলের নেতা কর্মীদের প্রায়ই বলতেন, "এ ট্রেটর ইজ এ ট্রেটের। ডেড অর অ্যালাইভ"। জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক চিন্তায় অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন ট্রেটর বা বিশ্বাসঘাতক। পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় একরকম বিনা চিকিৎসায় কবে যে চলে গেলেন কেউ তার খবর রাখেনি।

একই দশা হয়েছিল কট্টর গান্ধীবাদী রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের। তিনি ১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ লড়াই ঝগড়ায় তাঁকে পদ থেকে সরে যেতে হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ জানুয়ারি। নয়া মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৬২-র ১ জুলাই ডাঃ রায় ইহলোক ছেড়ে চলে যান। ডাঃ রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৯৬২-র ৮ জুলাই থেকে ১৯৬৭-র ১৫ মার্চ পর্যন্ত। তখন জ্যোতিবাবুরা প্রচার করতেন প্রফুল্লবাবু অগাধ কালো টাকার মালিক। সুইস ব্যাঙ্কে গোপন অ্যাকাউন্ট আছে।

কলকাতার ডালহৌসি পাড়ায় বহুতল স্টিফেন হাউসের আসল মালিক হলেন প্রফুল্ল সেন। অকৃতদার, সৎ গান্ধীবাদী এই মানুষটির গায়ে মিথ্যা অপপ্রচারের কলঙ্ক লেপন করে জ্যোতিবাবুদের কতটা স্বার্থসিদ্ধি হয়েছিল জানা নেই। যা জানা আছে তা হলো বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ কপর্দকহীন অবস্থায় সকলের অগোচরে প্রফুল্ল সেন চিরবিদায় নেন। সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় ছোট একটি খবর ছাড়া কোনও প্রচারই তিনি পাননি। তাই বলছি জ্যোতিবাবুর মতো ভাগ্যবান ভারতের কোনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন। সত্যিই জ্যোতিবাবু লগনচাঁদা নেতা।

অনেক ভাবনা চিন্তা করেও ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে জ্যোতিবাবুর বাংলা ও বাঙালিকে দেওয়া অবদানের লাগসই উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। এই অক্ষমতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যেটা মনে পড়ছে তা হচ্ছে ক্ষমতা দখলের পরেই জ্যোতিবাবুর নির্দেশে ফৌজদারি অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত সিপিএম কর্মীদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতরাও আছে। বর্তমান শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন তাদের মধ্যে একজন। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কীভাবে লাথি মেরে সরাতে হয় জ্যোতিবাবু সর্বপ্রথম দেশবাসীকে দেখান।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে জ্যোতিবাবুর নির্দেশে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেওয়া দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু শিবির থেকে আসা বাঙালি বর্ণহিন্দুদের পুলিশ রাতের অন্ধকারে অতি নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এমন নৃশংসতা হিটলারও দেখাতে পারেনি। হত্যার পর মৃতদেহগুলি লোপাট করা হয়। আজ পর্যন্ত জানা যায়নি যে মৃতের সংখ্যা কত ছিল। সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার কাগজপত্র যেমনভাবে লোপাট করা হয়, ঠিক সেইভাবেই মরিচঝাঁপির করুণ ইতিহাস জ্যোতিবাবুর নির্দেশে মুছে দেওয়া হয়। হিটলারও পারেনি ইহুদিদের নির্যাতন, হত্যার ইতিহাস এমন নিপুণভাবে মুছে দিতে।

এরপর ১৯৮২-র ৩০ এপ্রিল। দিন দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বিজন সেতুর উপর ১৮ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে সিপিএম হার্মাদরা। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু এমন নৃশংস ঘটনাকে আমলই দেননি। কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। বিচার হয়নি। হত্যাকারীরা শাস্তি পায়নি।

জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। এতটাই তিনি লগনচাঁদা নেতা। সেদিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অতটা ভাগ্যবান নন। নন্দীগ্রাম—সিঙ্গুরের অত্যাচার, হত্যার ঘটনার পর কলকাতার সুশীল সমাজ পথে নেমে প্রতিবাদ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার অনশন ধর্না চালিয়েছেন। মরিচঝাঁপির অসহায় রিফিউজিদের নির্মম হত্যার পর অথবা বিজন সেতুর উপর দিনের বেলায় হাজার মানুষের চোখের সামনে আনন্দমার্গীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনার পর কলকাতার রাজপথে একটিও প্রতিবাদ মিছিল কেউ দেখেনি। হ্যাঁ, তাই জোরগলায় দাবি করছি সারা ভারতে জ্যোতিবাবুর মতো লগনচাঁদা রাজনৈতিক নেতা দ্বিতীয় আর কেউ জন্মায়নি।

মাওবাদীদেরই মদত

(১ পাতার পর)

বাড়ি বাড়ি থেকে মেয়েরা থানা ঘেরাও করে। যৌথবাহিনী ধৃতদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই যৌথবাহিনী নিজেরাই মাওবাদীদের ভিত শক্ত করে দিচ্ছে।

ক'দিন বাদেই জঙ্গলমহলের এক জায়গায় যৌথবাহিনীর শিবির থেকে সামান্য দূরত্বে পালিত হয় শহীদ দিবস। সেই শহীদরা হল—যারা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় যৌথবাহিনীর গুলিতে মারা গিয়েছে। বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সভা। তারপর মিছিল। আরও একটা বিষয়। জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে মেলামেশা সবই করতেন। দু'-এক জন সাংবাদিক মালয়েশিয়ার টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গোয়েন্দাদের ছত্রধরের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরোক্ষে গ্রেপ্তারে সাহায্যই করেছিলেন বলা যায়। তাদের ভাবা উচিৎ ছিল—শুধুমাত্র মালয়েশিয়া থেকে টিভি-র সাংবাদিক লালগড়ে কেন আসবে! এর ফলে এখন মাওবাদীদের কাছে সাংবাদিকদেরও বিশ্বাসযোগ্যতা আর নেই। ফলে মাওবাদীদের জন্য ময়দান খোলা। কোনও সাক্ষী থাকছে না। লালগড়ে যাচ্ছে না কোনও সাংবাদিক। সব খবরও আসছে না। জঙ্গলমহলের শান্তিকামী মানুষের সমস্যা—মূর্তিমান সন্ত্রাস যৌথবাহিনী আর অদৃশ্য মাওবাদী, কাদের সঙ্গে তারা তালমিলিয়ে চলবেন? তাদের উভয় সঙ্কট। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, দাম্ভিক, বাতেলাবাজ নেতা নন তাদের কাছে মাওবাদীরা কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।

প্রশ্ন উঠেছে, যৌথবাহিনীর জনবিরোধী কার্যকলাপ গট-আপ কিনা। কেননা, যৌথবাহিনী যে অঢেল অর্থ ব্যয় করেও সাফল্যের মুখ দেখেনি তা তো খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

জঙ্গি নিশানায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

(১ পাতার পর)

হিসেবে চিহ্নিত করেছে লস্কর। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লী প্রধান সেনা কার্যালয়, পশ্চিম নৌ-সেনাবাহিনী এবং মুম্বাইয়ের অন্যান্য সেনা ক্ষেত্র যেমন সেখানকার ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজ। ডেভিড কোলেম্যান হ্যাডলির ধরা পড়ার পরে এখন এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তাদের 'টার্গেট'-গুলোতে আরও ভালভাবে নজরদারি করার জন্য বড়ধরনের আর্থিক 'প্যাকেজ' রয়েছে লস্করের। কিন্তু হঠাৎ 'বিজ্ঞানী'দের ওপর লস্করের নজর পড়ল কেন এবং তাদের ওপর 'নজরদারি'র বন্দোবস্তটা এখনও অবধি কিরকম তা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দ রয়েছে।

এর একটা সম্ভাব্য কারণ হতেই পারে যে গত পাঁচ-ছ বছরে ভারত বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তার আগের দশ বছরের তুলনায় প্রভূত উন্নতি করেছে। যার কয়েকটি নমুনা আপাতত দেওয়া যেতেই পারে। প্রথমত, ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত রসায়নে যেখানে আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রের সংখ্যা ছিল ২১,২০৬টি সেখানে ২০০৪-০৮ পর্যন্ত গবেষণা পত্রের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩,৫০৪টিতে। ফার্মাকোলজি এবং টক্সিকোলজিতেও গত ৫ বছরে ভারতের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪.২৫ শতাংশ। যেখান তার পূর্বে বিগত দশ বছরে (১৯৯৩-২০০৩) ওই অংশীদারিত্বের পরিমাণ ছিল ২.৮ শতাংশ। ১৯৯৩-২০০৩-এর ২.৬৯ শতাংশের তুলনায় কারিগরী শিক্ষার বৃদ্ধি ও ২০০৯-এ এসে হয়েছে ৩.৫৭ শতাংশ।

একই ভাবে মাইক্রোবায়োলজি সংক্রান্ত গবেষণাপত্রের সংখ্যাও গত পাঁচ বছরে, বিগত দশ বছরের তুলনায় ১.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অপরিসীম। এঁদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বিশ্বের দরবারে মুখ উজ্জ্বল করছে ভারতেরই। আর তাতেই লস্করের 'হিটলিস্টে' উঠে এসেছে এইসব বিজ্ঞানীদের নাম। তাঁদের নামগুলোকে গোপন রাখা হয়েছে।

সাগরযাত্রীদের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিবির

আউট্‌রাম ঘাটে এক ক্ষুদে ভারতের দৃশ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১০ জানুয়ারি কলকাতার আউটরামঘাটে অন্যান্য বারের মতোই গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রীদের জন্য শিবিরের উদ্বোধন হল। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর হনুমানের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং আর্য সমাজের সাধারণ সম্পাদক দীনদয়াল গুপ্তা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, প্রবীণ স্বয়ংসেবক যুগলকিশোর জৈথেলিয়া এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ধর্মসভায় প্রধান বক্তা স্বামী পরমাত্মানন্দ নাথ ভৈরব গিরি মহারাজ গঙ্গাসাগর তীর্থমাহাত্ম্য এবং সাগরতীর্থের কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে রামগোপাল সুঙ্গা জানান এই অস্থায়ী, শিবির চলবে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়া সাগরদ্বীপে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আটটি কক্ষ বিশিষ্ট স্থায়ী ধর্মশালা রয়েছে। সেখানে স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় চারহাজার তীর্থযাত্রীর থেকে-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অস্থায়ী শিবির উদ্বোধন।

(বাঁ দিক থেকে) রাজীব হর্ষ, কেশব দীক্ষিত, দীনদয়াল গুপ্তা, স্বামী পরমাত্মানন্দ ও অন্যরা।

বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালের পক্ষ থাকে উদ্যোক্তাদের শিবিরস্থানেই চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে। মেলা উপলক্ষে শিবির নির্মাণে সরকার কর্তৃক অনুমতি প্রদানে অযথা কালবিলম্ব ও হয়রানি করার অভিযোগ জানান পুরুষোত্তম মেমানি।

বিভিন্ন প্রদেশের নাগরিক সমিতির পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রীদের শিবিরের উদ্বোধন চলছে। সাগরের আগেই আউটরামঘাট এক যেন ক্ষুদে ভারত। অনেকেই দীর্ঘ যাত্রা করে রিজার্ভ বাসে এসে পৌঁছেছেন। হিন্দু পরম্পরা এবং আদর্শ মেনেই তীর্থযাত্রীদের সেবা করতে সকলে নেমে পড়েছেন।

২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বের রেকর্ড

(১ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গকে কি দিয়ে গিয়েছেন? বেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রেজারি, পোস্ত্রো, চপলা সর্দার, বানতলা, শাসন, ছোট আঙারিয়া, নানুরের গণহত্যায় তাঁর অবদান কম নয়। বউবাজার বিস্ফোরণও তাঁর আমলে। শিল্পে-শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ক্রমাবনতির অন্যতম কাণ্ডারী তিনি। তাই তাঁর এমন সময়ে রাজ্যবাসীর মনে তেমন প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকী সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর মৃত্যুতেও প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। কারণ সুভাষবাবু একটি পাইয়ে দেওয়া শ্রেণী তৈরি করতে পেরেছিলেন। খুনি থেকে সঙ্গীতশিল্পী সবাই ছিলেন তাঁর অতিপ্রিয়। জ্যোতিবাবু অবশ্য কারও জন্য কিছু করেছেন এমন অপবাদ নেই। মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে যা করেছেন সবই ছেলে চন্দন বসুর জন্য। সামান্য ক্লার্ক থেকে বড় শিল্পপতি হয়েছেন তিনি। তাই সিপিএমকে কষ্ট করে লোক জোগাড় করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্যোতি বসুকে ঘিরে কোনও আগ্রহ চোখে পড়েনি। টিভি চ্যালেনগুলোর ব্যাপার অবশ্য আলাদা। ওটাও ব্যাবসাকেন্দ্রিকই বটে।

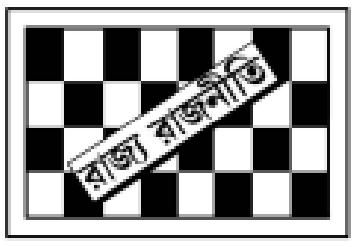

রাজ্য রাজনীতি

অন্তর্দ্বন্দ্বের চোরাস্রোতে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি

নিশাকর সোম

এখন তো রাজ্য রাজনীতি জ্যোতি বসু'র অসুস্থতা নিয়ে উত্তাল। এরই মধ্যে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, "শুদ্ধি করণ উপরতলা থেকে শুরু হবে। আমিও শুদ্ধি করণ-এর বাইরে নই। আমিও ত্রুটিমুক্ত নই।" যে-কথাগুলি এই কলামে বারবার লেখা হয়েছিল—সে-কথাই বিমান বসু'র কণ্ঠে ধ্বনিত হলো। এখন দেখা যাচ্ছে, সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্বের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন বুদ্ধ বাবু সর্বদলীয় সভায় তৃণমূলকে বারবার আহ্বান জানাচ্ছেন। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন তো পরোক্ষে মমতা ব্যানার্জিকে শিল্পবন্ধু বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ-সব হওয়ার কারণ হলো সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের ব্যাপক অংশ বসে গেছেন। তার নজির দেখা গেল ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের সামনে। "শহীদ" পরিবারের জন্য কলকাতা জেলার অর্থসংগ্রহ অভিযান ফ্লপ হয়ে গেল। সেখানে প্রশান্ত চ্যাটার্জি ও রবীন দেব-কে নিয়ে মোট ১৫-১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিপিএম-রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে গোষ্ঠীবন্ধন-এর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য বর্ধমানগোষ্ঠী অর্থাৎ নিরুপম-মদন ঘোষ-বিনয় কোঙার-এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছেন। বুদ্ধ বাবু নিরুপম সেনকে আর সহ্য করতে পারছেন না। উল্লেখ করা প্রয়োজন টাটারা প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলেও পরবর্তীকালে যে কোনও কারণেই হোক নিরুপম সেনের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজভবনে যে-'চুক্তি'তে বুদ্ধ বাবু সম্মত হয়েছিলেন—সে নিয়ে নিরুপম সেন বিরুদ্ধে ছিলেন। নিরুপমবাবু রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেববাবুর দুর্বলতার কথা বলেছিলেন। নিরুপমবাবু আরও বলেছিলেন, বুদ্ধ বাবুর প্রকাশ্য হুমকি বিরোধীদলকে হিংস্র করে তুলেছিল। যেহেতু এখন পার্টি জ্যোতি বসুর অসুস্থতা নিয়ে ব্যস্ত তাই দ্বন্দ্বের ঘটনা আর এগোতে পারছে না। তবে এই মুহূর্তে নতুন এক বিতর্ক তুলেছেন সুভাষ-জায়া রমলা চক্রবর্তী। তিনি বললেন,—"সুভাষের শরীর থেকে আধ-বালতি রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল। ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে সুভাষ আরও ২০ বছর বাঁচতো।" এতো শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়—পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লিখিত অভিযোগ চেয়েছে। রমলা কেন তখন কিছু বলেননি? এর জবাবে রমলা বলেছেন, 'তাহলে হাসপাতাল ভাঙচুর হতো!' সুভাষবাবুর মৃত্যুর পর অভিনেতা নিমু ভৌমিক বলেছিলেন, "কোনও চিকিৎসা হয়নি।" এসব কথা রমলা সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেছেন। জ্যোতি বসুর চিকিৎসায় কি রমলার ঈর্ষা জেগেছে? জ্যোতি বসু তো সুভাষ চক্রবর্তীর "শ্রীকৃষ্ণ", "লিডার অফ দ্য লিডার্স"!

> ❝ বিরোধীনেত্রী মমতা ব্যানার্জি রোজা, ইফতার-থেকে শুরু করে মহরমের মিছিলে যোগ দিয়ে নিজেকে মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত (?) বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইহার নাম ভোট ক্যাচিং কৌশল। ❞

একথা বলা যায়—সুভাষ চক্রবর্তীর মতোন সুভাষ-জায়া রমলাও বিতর্কিত হয়ে প্রচারের আলোকের সামনে আসতে চাইছেন। তবে তাঁর এই আচরণ এখন আর পার্টি সহ্য করবে কি?

এদিকে রেজ্জাক মোল্লা পার্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এমন এক অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যে তাঁকে কেউই নামাতে পারবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগণার আর এক নেতা-মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি সুভাষবাবুর চালে না চলে ইতিমধ্যেই সুভাষবাবুর ত্রুটি প্রকট করে দিয়েছেন। রমলার এই হঠাৎ বিতর্ক সম্পর্কে রাজ্য-কমিটির একনেতা বললেন যে, পরিবহনের নানা দুর্নীতি প্রকাশ হওয়াতে রমলা এইসব কথা বলছেন। কারণ পরিবহণমন্ত্রী হিসাবে এর দায়-দায়িত্ব সুভাষ চক্রবর্তীর উপরও বর্তাচ্ছে না?

তাই তো রেজ্জাক বলেছেন, "পাপ আর পারা চাপা থাকে না।" পার্টির নিচের তলার একাংশ নেতাদের মুখোশ খুলে দিতে উদ্যোগী হচ্ছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত জাতীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় কমিশন-এর সদস্য এ আলি আজিজ বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের অবস্থা গুজরাটের থেকেও খারাপ।" এক সাচার কমিটির ধাক্কা—এর পর আবার এক ধাক্কা।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে বলেছিলেন, "সকল সম্প্রদায়ের অনগ্রসরদের দেখতে হবে।" এতে মুসলিম নেতারা রুষ্ট হন। অতীতে কয়েকজন মুসলিম নেতা তো বুদ্ধ বাবুকে "পশ্চিমবঙ্গের বাল ঠাকরে" বলে অভিহিত করেছিলেন। এ-দিকে বিরোধীনেত্রী মমতা ব্যানার্জি রোজা, ইফতার-থেকে শুরু করে মহরমের মিছিলে যোগ দিয়ে নিজেকে মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত (?) বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইহার নাম ভোট ক্যাচিং কৌশল।

আগেই এ-কলামে লেখা হয়েছে—রাজ্য-কংগ্রেসকে ভাঙার জন্য তৃণমূলনেত্রী সোমেন মিত্রকে নিয়োগ করেছেন। তা সত্য বলে প্রমাণিত হলো সোমেন মিত্র বহরমপুরের অধীর চৌধুরী-বিরোধীদের মমতা-সমীপে এনে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এরপর সোমেন মিত্র পৌরসভা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা একের পর এক কলকাতা নেতাদের টোপ দিচ্ছেন। শীঘ্রই কলকাতার কিছু নেতা নাকি তৃণমূল-এ যোগ দেবেন? রাজ্যের কংগ্রেসকে ভাঙার আর একটি ধাপ নেওয়া হচ্ছে। প্রদীপ ভট্টাচার্যকে রাজ্য থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। রাজ্য-কংগ্রেস-এর আর এক নেতা সুব্রত মুখার্জির একমাত্র লক্ষ্য হলো রাজ্য-সভায় যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে স্থায়ীভাবে টিকে থাকা।

তৃণমূল কংগ্রেসেও দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত আছে। সৌগত রায় কোথায়? বস্তুত, অধিকারীরা তৃণমূলের নেতৃত্ব অধিকার করে নিয়েছেন। কলকাতার পৌরনির্বাচনে তৃণমূলের প্রজেক্টপ্রার্থী হিসাবে একাধিক নাম আছে—বিরোধীনেতা জাভেদ খান, ববি হাকিম, রাজীব দেব, স্বপন সমাদ্দার, শোভনদেব চ্যাটার্জি এবং পরেশ পাল।

এ-দিকে কংগ্রেসের প্রদীপ ঘোষ (গালকাটা নীলু) ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি পাল্টা বোড়ের চালে মাৎ করার বোড়ে সাজাচ্ছেন। তাই পৌরনির্বাচনে দলাদলি জমে উঠবে। নেত্রী বলেছেন, "রাজ্য সরকারে না গেলে চাকরি দেওয়া যাবে না।" তার মানে ২০১১-এর পর শুধু তৃণমূলীরাই চাকরি পাবেন—ধন্য ভোটরঙ্গ। লাল-সবুজ সবই সমান।

অঢেল রকম

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'এই রোকো। পৃথিবীর গাড়িটা থামাও। আমি নেমে যাব'—সলিল চৌধুরীর গানের কলিগুলো প্রায় অবিকৃত রেখে এধরনের গান গুরগাঁও-এর তাজনগরবাসীর কণ্ঠে শুনতে পেলে মোটেই আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য এই গানটা গাওয়া-র ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে তাদের থেকেই যাচ্ছে। মানে বাংলা ভাষাটা-তো তাঁরা সেভাবে জানেন না (প্রবাসী বাঙালী হলে আলাদা কথা)। সুতরাং গাইতে গেলে কথা আর সুর দুটোই 'কেটে যাবার' একটা প্রবল সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাতে কি? গানের সুর কাটতে পারে, কাজের সুর তো আর কাটেনি!

তাজনগর স্টেশনে প্রথম অতিথি।

প্রতিবেদনের খাতিরে যথেষ্ট 'সাসপেন্স ক্রিয়েট' করা হয়েছে, বিষয়টা এবার একটু খোলসা করা যাক! প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে গুরগাঁও-এর তাজনগরের অধিবাসীরা তাদের গ্রামে রেলস্টেশন করার জন্য দাবী জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষের কাছে সেই 'দাবী' ছিল নিছকই 'আব্দার' মাত্র। সুতরাং এই বেয়াড়া আব্দারে কর্ণপাত করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করেননি তাঁরা। দীর্ঘ ২৫ বছর অপেক্ষা করার পর একটা সময়ে গ্রামবাসীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল।

কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মতো 'ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার' প্রতিবিধান কল্পে অবরোধ-ভাঙচুর-বিক্ষোভের মতো সস্তা রাজনীতির রাস্তায় গেলেন না তাঁরা। রেল-কর্তৃপক্ষকে অনুনয় বিনয় করবার পুনঃ প্রচেষ্টাও করলেন না তাজনগরের গ্রামবাসীরা। বরঞ্চ নিলেন কঠিন এক সংকল্প। নিজেরাই রেল স্টেশন গড়ে তুলবেন নিজেদের গ্রামে। দেখিয়ে দেবেন সবাই-কে। কিন্তু সংকল্প 'নেওয়া' এক জিনিস, আর তা 'রাখতে পারা' অন্য এক জিনিস। কমসে কম লাখ বিশেকের মতো টাকা লাগবে একটা রেল স্টেশন তৈরি করতে গেলে। কে যোগাবে এত টাকা? গ্রামবাসীরা স্টেশন তৈরির ব্যাপারে এককাট্টা হতে পারেন কিন্তু বাইরের লোকের কাছে এটাতো পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। এছাড়া সমগ্র গ্রামবাসীদের সংখ্যাও যে মুষ্টিমেয়!

সংকল্পে যারা অটল তাদের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। যে জন্য তাজনগরবাসীরা, নিজেদের মধ্য থেকেই অনুদান নিতে শুরু করলেন। অবস্থা বুঝে ৩০০০ থেকে ৭৫,০০০ জন প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা উঠতে লাগল। সেই সংগৃহীত অনুদান থেকেই মোট ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হলো তাজনগর স্টেশন। যে স্টেশনটি সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র স্টেশন যা গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার এক পয়সাও ব্যয় করেনি। এ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টেশন না হয় তবে আর কোনটা হবে?

গত ৬ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার প্রথম ট্রেনটি থামে গুরুগাঁও-এর তাজনগর স্টেশনে। রেল মন্ত্রকের আধিকারিক অনন্ত স্বরূপের মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"আমরা প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোকে এখানে দাঁড় করাব বলে ঠিক করেছি। এটা আর্থিক দিকদিয়েও অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমাদের ধারণা। স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী এই স্টেশন তৈরির প্রকল্পটি রূপায়িত হয়। আমরা গ্রামবাসীদের শুধু কয়েকটা নকশা দিয়েছিলাম। বাকিটা যা করার তাঁরাই করেছেন।" আপনিও এখন নিশ্চিন্তে নামাতে পারেন তাজনগর স্টেশনে।

বাম শাসনে গ্রাম ত্রিপুরা

সংবাদদাতা ॥ গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও উন্নত হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থা সাইনবোর্ড সর্বস্ব। স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল। পানীয় জলের জন্য গ্রামের উপজাতি মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। এহেন বেহাল অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঋষ্যমুখ ব্লকের উপজাতি অধ্যুষিত লেংটাবাড়ীর গ্রামের মানুষ দিন যাপন করছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামের উপজাতি মানুষ বারবার প্রশাসনের কাছে মাথা ঠুকলেও কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে গ্রামের উপজাতি মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গ্রামের নাম লেংটাবাড়ী। ঋষ্যমুখ ব্লকের উপজাতি অধ্যুষিত কৈলাসনগর এ ডি সি ভিলেজের অন্তর্গত এই উপজাতি জনপদ। এই পাড়ায় মোট চৌদ্দ পরিবারের বসবাস। গ্রামের সবাই উপজাতি। প্রায় সবাই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে।

সম্প্রতি মহকুমা শাসকের উদ্যোগে লেংটাবাড়ী গ্রামে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের উপজাতি মানুষ প্রকাশ্যে গ্রামের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। শুখা মরশুমে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের সংকট ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সংস্কার করা হলেও তা কোন উপকারে আসছেনা। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল। লেংটাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হবে। শিশুদের কোন প্রকার টীকাকরণ হয় না। আজও এই গ্রামের নয়জন শিশুর কোন প্রকার টীকাকরণ হয়নি। শিশুর টীকাকরণ, গ্রামের বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার সম্প্রসারণ করা হলেও বৈদ্যুতিক সংযোগ

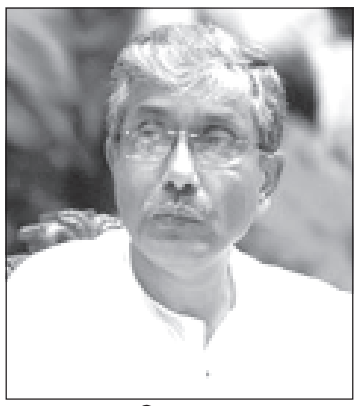

মানিক সরকার

দেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের বক্তব্য হল গ্রামে একসময় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল কুটির- জ্যোতি প্রকল্পে।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টাকা জমা না দেওয়ায় বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

যার ফলে শুখা মরসুমে পানীয় জলের একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়ছে।

কালিয়াচক হয়ে ঢুকছে হুজি জঙ্গিরা

সংবাদদাতা ঃ মালদার কালিয়াচক যে বাংলাদেশী হুজি (হরকত উল জিহাদ) উগ্রপন্থীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণস্থল তা আরও একবার প্রমাণিত হলো গত ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনায়। ভোরের কুয়াশার সুযোগে খোলা সীমান্ত পেরিয়ে একদল হুজি জঙ্গি বাংলাদেশ থেকে ঢুকে পড়ে। আগে থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশ ওঁৎ পেতে ছিলই। কিন্তু পুলিশের অকর্মণ্যতার সুযোগে জঙ্গিরা পালিয়ে গেল। গোয়েন্দারা উদ্ধার করল তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক রিভলবার, ডিটোনেটর, কার্তুজ ও প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক। ৩০ ডিসেম্বর ভোর ৪-২০ মিনিটে উগ্রপন্থীদের তাড়া করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী। ঘন কুয়াশার আড়ালে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা পালিয়ে গেলেও ফেলে যায় একটি ব্যাগ ও কম্বল। ব্যাগের মধ্যে সব্জির নীচে ছিল নানান কিসিমের রিভলবার, ৭.৬২ এম এম এস এল আর-এর কার্তুজ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক। ব্যাগের মধ্যে পাওয়া কাগজ-পত্র থেকেই হুজি জঙ্গিদের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও কাগজপত্র কালিয়াচক থানায় জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গি ঢোকার সিংহদ্বার বলেছিলেন।

বাংলাদেশ কি কলকাতা-কোচবিহার সোজা রাস্তা খুলে দেবে ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এযাবৎ যা হয়নি এবারে তা-ই হলো। পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়েই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর হলো। ১১ জানুয়ারি এসে ১৩ তারিখেই ঢাকায় ফিরে গেছেন তিনি। রাজভবনে স্থায়ী রাজ্যপালের অনুপস্থিতি এবং বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভের কারণেই নাকি সফরের এই কাটছাঁট। যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে এক ভাষাভাষী হওয়ার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর। এবারের সফরে ভারত বাংলাদেশের পরিকাঠামো নির্মাণে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্যাকেজই হাসিনার হাতে তুলে দেয়নি, অধিকন্তু ভারতের মধ্য দিয়ে ভূটান ও নেপালের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধাও করে দিয়েছে। অথচ বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারত এমন কোনও সুবিধা আদায় করতে পারেনি। কলকাতা থেকে কোচবিহারে যদি সরাসরি যাওয়া যেত অর্থাৎ বাংলাদেশ সেই অনুমতি দিত তাহলে এই দুই শহরের দূরত্ব দাঁড়াত মাত্র ৪৮০ কিলোমিটার। এখন ঘুরে যেতে হয় বলে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় ৬৯৬ কিলোমিটার। অর্থাৎ ২১৬ কিলোমিটার বেশি। আবার রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ির দূরত্ব মাত্র ১০৫ কিলোমিটার। কিন্তু এখন ৮০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

আগরতলা ও শিলচর পশ্চিমবঙ্গে না হলেও দুটো শহরই বাংলাভাষী শহর। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলকাতা থেকে আগরতলা ও শিলচরের দূরত্ব যথাক্রমে মাত্র ৪৩০ এবং ৬২০ কিলোমিটার। কিন্তু বাংলাদেশ অনুমতি না দেওয়ার এই দূরত্ব দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬২৯ এবং ১৩৭৮ কিলোমিটার। অথচ একদেশের একাংশ থেকে সেই দেশেরই অন্য অংশে দ্বিতীয় দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দুই জার্মানির পুনর্মিলনের আগে পশ্চিম বার্লিন শহরে (যা পূর্ব জার্মানীর মাঝখানে, কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত ছিল) সমস্ত পণ্য পৌঁছাত রেলপথে পূর্ব জার্মানির মধ্য দিয়ে। নেপাল বা ভূটানের সমুদ্রপথে আমদানি বা রপ্তানীকৃত পণ্য ভারতের উপর দিয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশকেও এই দুই দেশের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশও কি কলকাতা থেকে কোচবিহারে যাওয়ার সোজাসুজি রাস্তা খুলে দেবে? অথবা কলকাতা থেকে আগরতলা

অর্থবর্ষ শেষ হতে চলল

বরাদ্দের ৬০ ভাগও খরচ করেনি ত্রিপুরা সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অর্থ বছরের আর মাত্র তিন মাস বাকি। কিন্তু এখনও রাজ্য সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরের ষাট শতাংশ অর্থও খরচ করতে পারেনি। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের রাজ্যের প্ল্যান আউট লে ছিল ১৬৮০ কোটি টাকা। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে অর্থ দপ্তরের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দপ্তর মাত্র ৬১৮ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে ৪২টি প্ল্যান। শুধু তাই নয়, হস্ততাঁত, কারুশিল্প, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, শিল্প-বাণিজ্য, আইন, প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী, জলসম্পদ, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রায় ৮/৯টি দপ্তর তাদের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ব্যয়িত অর্থের এখন পর্যন্ত হিসাবই জমা দিতে পারেনি অর্থ দপ্তরে। গত নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের পৌরোহিত্যে নতুন সচিবালয়ে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের খরচ ইত্যাদি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকেও উল্লিখিত দপ্তর যেগুলি যে ঠিকঠাকভাবে বরাদ্দকৃত অর্থের খরচ করতে পারেনি তা পরিস্কার হয়। কালবিলম্ব না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের খরচের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু দুই মাসেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুব কম দপ্তরই অব্যয়িত অর্থের খরচের উদ্যোগ নিতে পেরেছে। বহু দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত অফিসাররা এল টি সি'তে চলে গেছেন। কিন্তু কাউকে অফিসের কাজ বুঝিয়ে যাননি। উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিত যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের একটি বিশাল অর্থরাশি যে এ বছরও অব্যয়িত থাকবে এটা বলাই বাহুল্য।

জানা গেছে, রাজ্য সরকারের এমন বেশ ক'টি দপ্তর রয়েছে যেমন, কৃষিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, নগর উন্নয়ন দপ্তর, প্রিন্টিং এন্ড

স্টেশনারী দপ্তর, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর ১০ শতাংশ অর্থও খরচ করতে পারেনি। অথচ এই দপ্তরগুলির পক্ষে জনগণের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার প্রভূত সুযোগ রয়ে গেছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ না করতে পারলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক মহল এসব অফিসার আমলাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে, প্রতিটি সিদ্ধান্তের ফাইলই দপ্তরের অধিকর্তা থেকে সচিব-কমিশনার হয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত ফাইল চালাচালির কারণেই। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এত বেশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে তার ফলে কোনও আমলা অফিসারই নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নিতে চান না। আর এটা করতে গিয়েই সবচেয়ে বেশী বিলম্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত রূপায়ণে।

আধুনিক ল্যান্ডিং গ্রাউণ্ড তৈরি হচ্ছে অরুণাচলে

সংবাদদাতা ঃ অরুণাচল প্রদেশের মেছুকায় শীঘ্রই গড়ে উঠবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধুনিক উড্ডয়ন ও অবতরণ ক্ষেত্র। সরকার এজন্য ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরকে এখানে ৫০ হাজার ৯৬৫ হেক্টর জমি দ্রুত বন্দোবস্ত করে দিতে বলেছে। ৯৯ বছরের জন্য পশ্চিম সিয়াং জেলা প্রশাসন এই জমির প্রতি স্কোয়ার মিটার ১ টাকা হিসেবে লিজ দেবে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে।

গত ৯ জুন অরুণাচলপ্রদেশ সরকার মেছুকা সহ রাজ্যের ৮টি বিমান ক্ষেত্রকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাতে তুলে দেয়। এই মর্মে একটি সমঝোতা পত্রও স্বাক্ষরিত হয়

রাজ্যের মুখ্য সচিব তাবোম বাম এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের (প্রাক্তন) সচিব বিজয় সিং এর মধ্যে। এছাড়া বাকী ৭টি বিমান ক্ষেত্র হচ্ছে অয়ালং, টুটিং, বিজয়নগর, আলোং, জিরো, তাওয়াং ও পাসিঘাট। মেছুকা সহ সব বিমান ক্ষেত্রকেই এডভান্সড্ ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড হিসাবে তৈরী করা হবে। প্রথমেই এটা করা হবে মেছুকায়। তারপর অয়ালং এবং আলোংয়ে।

এই দুটি বিমান ক্ষেত্র চীন সীমান্তে। চীন ফের অরুণাচলপ্রদেশ গ্রাস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দ্রুত এডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড গড়ে তোলা হবে। যাতে জরুরী প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে চীনকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া যায়।

আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি তে বিহারও প্রথম সারিতে উঠে এল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহার মানেই দারিদ্র্যের এনসাইকোপিডিয়া কিংবা দুর্নীতির পীঠস্থান অথবা কু-শাসনের পরম্পরা—এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই রাজ্যটি সম্পর্কে যাই কিছু ভেবে থাকুন না কেন, এখন নীতিশ-সুশীলের রাজ্যে এলে সেই ধারণাটা পাল্টাতে বাধ্য। নীতিশ-সুশীল মানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। এঁদের

সুশীল মোদী

নীতিশ কুমার

যৌথ নেতৃত্বে দারিদ্র্যের যাবতীয় অভিমান ঘুচিয়ে বিহারের আর্থিক বৃদ্ধি এই মুহূর্তে ১১.০৩ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারতবর্ষের বাকি সবকটি রাজ্যকে পেছনে ফেলে বিহারের অধরা মাধুরী এখন কেবল গুজরাত।

সম্প্রতি ভারত সরকারের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতির থেকে অনেক দ্রুততর গতিতে বিহারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে। যে কারণে জাতীয় আর্থিক বৃদ্ধির হার যেখানে ৮.৪৯ শতাংশ, সেখানে বিহারের আর্থিক বৃদ্ধির হার ১১.০৩ শতাংশ। বিহারের আগে একমাত্র গুজরাত-ই রয়েছে, যার আর্থিক বৃদ্ধির হার ১১.০৫ শতাংশ। লালুর জমানায় যে রাজ্য আর্থিক ঘাটতি-তে চলছিল, তার এহেন অবস্থা বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে বিশেষজ্ঞ থেকে রাজনীতিবিদদের। উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর ভাষায়—''নিউ মিরাকেল ইকোনমি''।

বলাই বাহুল্য, নীতিশ-সুশীল পূর্ববর্তী জমানায় বিহারবাসীকে যে দুর্নীতি ও কুশাসনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, বর্তমান শাসককুলের আমলে তার থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছেন তাঁরা। একটা সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে 'বিমারু' শব্দটি বেশ প্রচলিত ছিল। আর্থিক ভাবে অনগ্রসর চারটি রাজ্য—বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশকে একত্রে বোঝাতে এই 'বিমারু' (ইংরেজি বানান BIMARU) শব্দটি প্রযোজ্য হোত। বলা হোত যে বিমারুর জন্যেই ভারতীয় অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন যে তথ্যাবলী প্রকাশ করেছে তাতে এরকম কথা বলার আর জো নেই। কারণ বিহারের সঙ্গে সঙ্গে বিহার ভেঙ্গে গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চলতি বছরে আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৮.৪৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে গঠিত ছত্তিশগড়-এর এই বৃদ্ধি ৭.৩৫ শতাংশ; পিছিয়ে রয়েছে শুধু উত্তরপ্রদেশই। তাদের আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৬.২৯ শতাংশ। এই তথ্যগুলো থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্বকে গ্রাস করে রাখলেও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি এর প্রকোপ থেকে মুক্ত হবার সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। আর তাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে অবশ্যই নরেন্দ্রমোদীর গুজরাত এবং নীতিশ-সুশীলের বিহার।

অথচ সারা বিশ্বজুড়ে যখন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জোয়ার চলছিল অর্থাৎ ২০০৩-০৪ সাল নাগাদ, তখন বিহারের দিকে তাকালে তাদের আজকের এমন রমরমা অবস্থাটা কল্পনা করাও দুষ্কর হতো। নীতিশ-সুশীল যখন বিহারের ক্ষমতায় আসীন হন, তখন বিহারের আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫.১৫ শতাংশ। মাত্র চার-বছর রাজত্ব করেই এই পরিস্থিতিটা আমূল পাল্টে ফেলেন নীতিশ-সুশীল জুটি। গত বছর (২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে) বিহারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১১.৪৪ শতাংশে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে নেমে আসা আর্থিক মন্দা কিছুটা হলেও ব্যাহত করে বিহারী অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি। কিন্তু সেই ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে বিহার আবার লম্বা রেসের ঘোড়ার মতোই এখন 'অর্থনৈতিক' দৌড় শুরু করেছে। কিছুদিন পূর্বেই অমর্ত্য সেন এবং যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বিহার ঘুরে এসে বলেন, গত তিন বছরে বিহারে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েচে।

গত বছরের জুলাই মাসে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাঙ্ক যে প্রতিবেদন তৈরি করেছিল তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরীখে বিহার ছিল চোদ্দতম স্থানে। ভারতের অন্য তিনটি শহর চেন্নাই, কোচি এবং কলকাতার তুলনায় পাটনাকেই ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করবার জন্য সহজতম স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছিল ওই প্রতিবেদনটিতে। 'ডুইয়িং বিজনেস ইন ইন্ডিয়া, ২০০৯' শীর্ষক সেই প্রতিবেদনের অংশটিতে ১৮১টি অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচক নির্ধারিত হয়েছিল।

তবে সবচেয়ে বিস্ময়প্রদ তথ্যটিই অপেক্ষা করছে পাঠকের জন্য। বিশ্বের যে'কটি রাষ্ট্রের যতগুলো অঞ্চলের তথ্য এখনও অবধি পাওয়া গিয়েছে এবং ১৮টি ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজ্য মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের (স্টেট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) নিরীখে এক নম্বরে রয়েছে বিহার। এই তথ্য সেই সময়েই গৃহীত হয়েছিল যখন বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা সংঘটিত হতে শুরু করেছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ থেকে একধাক্কায় নেমে এসেছিল ৬.৭ শতাংশে। তখনও নীতিশ কুমার-সুশীল মোদীর রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১১.৪৪ শতাংশ।

জম্মুর প্রতি বৈষম্য চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মুবাসী বিশেষত হিন্দুদের প্রতি জম্মু-কাশ্মীর সরকারের বিভেদমূলক নীতি ও আচরণ গত ৬২ বছর ধরে চলে আসছে। তা এই রাজ্যের শাসনভার যার হাতেই থাকুক না কেন—ন্যাশন্যাল কনফারেন্স, পি ডি পি বা কংগ্রেস।

সরকারে বসার পরই শেখ আবদুল্লার 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' স্বমূর্তি ধারণ করে। হিন্দুবহুল এলাকার সঙ্গে একতরফা বিভেদাত্মক সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালু হয়ে যায়। জম্মুতে প্রজা পরিষদের প্রবল আন্দোলনের চাপে নেহরু ১৯৫৩ সালে নিজের ভুল শোধরানোর ব্যর্থ প্রয়াস করেন শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করে। আজও জম্মু-কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা শেখ আবদুল্লার পুত্র ফারুক আবদুল্লার হাত ঘুরে তস্য পুত্র ওমর আবদুল্লার হাতে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক নীতির পরিবর্তন হয়নি। উল্টে নতুন নতুন আইন করে জম্মু-বাসীদের ব্যক্তি- স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতেই পারে—জম্মুর কোনও মেয়ে বা ছেলে জম্মু-কাশ্মীর এলাকার বাইরে বিয়ে করলে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন।

সাম্প্রতিক সময়ে এরকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগঠন 'হুরিয়ত কনফারেন্স'-এর কাজ কর্ম।

জম্মুর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির জাজ্বল্যমান উদাহরণ

	বিষয়	কাশ্মীর	জম্মু
১.	ভৌগোলিক এলাকা....	১৫৯৪৮ বর্গ কি.মি....	২৬২৯৩ বর্গ কি.মি.
২.	উপার্জন (সরকারি রাজস্ব বাবদ আয়)	২০ শতাংশের কম....	৭৫ শতাংশের বেশি
৩.	ভোটার (২০০২)	২,৮৮,৩৯৫.....	৩০,৫৯,৯৮৬
৪.	বিধানসভা আসন....	৪৬.....	মাত্র ৩৭টি
৫.	প্রতি বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা	৪৯,৭২৩ জন.....	৬৬,৫২১ জন
৬.	বিধানসভা পিছু ভৌগোলিক আয়তন	৩৪৬.৬ বর্গ কিমি....	৭১০.৬ বর্গ কিমি.
৭.	লোকসভার আসন	.... ৩	২
৮.	" " পিছু ভোটার	৯৬১.৩১৮.....	১৫,২৯৯৩
৯.	মন্ত্রীসভায় প্রতিনিধিত্ব	বেশি	কম
১০.	জেলার সংখ্যা	....১০.....	১০....
১১.	জেলায় একটিমাত্র মহকুমা	....২.....	সব জেলাতেই একাধিক মহকুমা
১২.	গড়ে প্রতি জেলার এলাকা	১৫৯৪ বর্গ কিমি.	২৬২৯ বর্গ কিমি.
১৩.	বেকারত্বের হিসাব	২৯.৩০ক্ষ	৬৯.৭০ক্ষ
১৪.	কর্মচারী সংখ্যা	৩ লক্ষের বেশি	১.২ লক্ষের কম
১৫.	সচিবালয়	৭৫ক্ষ এর বেশি	২০ক্ষ কম সময়াবধি
১৬.	কাশ্মীরী কর্মচারী	৯৯ক্ষ এর বেশি	২৫ ক্ষ-এর কম
১৭.	জম্মুবাসীর আয়		কাশ্মীরীদের তুলনায় ৭৫ শতাংশের কম
১৮.	জনস্বাস্থ্যবিভাগে দৈনিক মজুরী	২১০০ টাকা	৫০০ টাকা মাত্র
১৯.	রাজ্য কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন (রাজ্য দ্বারা)	৩০৪ মেগওয়াট	২২ মেগাওয়াট
২০.	গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ	১০০ শতাংশ	৭০ শতাংশের কম
২১.	দীর্ঘতম সড়কের হিসাব	৭১.২৯ কিমি	৪৫.৭১ কিমি.
২২.	শতাংশ হিসাবে	৫১.৭ শতাংশ	২৩.১ শতাংশ
২৩.	কৃষি-সেচ-নগর উন্নয়নে খরচ	৭০ ক্ষ বা তার বেশি	৩০ শতাংশের কম

চীনকে সাহায্য করতেই কি হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুকেন্দ্র ?

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। এখানকার বেশ কয়েকটি অঞ্চ লের মাটি পরীক্ষার প্রাথমিক কাজকর্মও সেরে ফেলেছে পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্যরা। অপরদিকে সেখানকার মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী মানুষেরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন। এখন প্রশ্ন হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র কার স্বার্থে? নন্দীগ্রামে ধাক্কা খেয়ে রাজ্য সরকার পূর্ব-মেদিনীপুরের মানুষকে জব্দ করতে চাইছেন। এজন্যই নয়াচরে কেমিকেল হাব আবার চন্দ্রকোণায় রসায়ণ প্রকল্প এবং হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯৮৮ সাল থেকে রাজ্যসরকার বারবার বাঁকুড়া, সুন্দরবন ও দাঁতনে পারমাণবিক চুল্লী বসানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বারবারই সাধারণ মানুষ ও পরিবেশ কর্মীদের প্রবল বাধায় এই প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হয়। পরে কাঁথির মতো জনবসতিপূর্ণ এবং কৃষিভিত্তিক এই অঞ্চ লে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ কেন্দ্রের সহযোগিতায় পশ্চি মবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে উৎসাহী হলেও ২০০৬ সালের ২৭ আগস্ট পিপলস্ ডেমোক্রেসীতে সীতারাম ইয়েচুরি লিখেছেন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার বিরুদ্ধে। তাঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, 'ভারতের বিদ্যুতের মোট চাহিদার মাত্র আড়াই শতাংশ মেটাতে পারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৫ ভাগই কয়লা নির্ভর এবং আমাদের নিশ্চি তভাবেই আরও আড়াইশো বছরের জন্য কয়লার ভাণ্ড ার মজুদ রয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুতের তুলনায় জলবিদ্যুৎ খরচ ও উপযোগিতার বিচারে ৩৩ গুণ বেশি। প্রতি বছর বন্যায় শয়ে শয়ে মানুষ মারা যান। যদি নদীর জলকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাতে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে। এতে যেমন বন্যার হাত থেকে মানুষকে বাঁচনো যাবে, তেমনই আমরা আরও পঞ্চ াশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি। এমন কী আমেরিকাতেও গত তিন দশকে একটিও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়নি।"

লোকসভায় শক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কে সিপিএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া প্রশ্ন তোলেন, আমাদের যখন বিপুল জল বিদ্যুতের সম্ভ াবনা আছে, আমরা কেন পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য দৌড়াব? পারমাণবিক বিদ্যুৎ শুধু যে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ তাই নয়, আমাদের তা পুরোপুরি আমেরিকার উপর নির্ভরশীল করে তুলবে। (লোকসভায় বাসুদেব আচারিয়ার ভাষণ ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ —পিপলস ডেমোক্রেসী)। পারমাণবিক বিষয়গুলি নিয়ে সিপিএম দলের দ্বিচারিতা বহুদিনের। অন্ধ্রপ্রদেশে ইউরেনিয়াম প্রকল্পের তোড়জোড় করাতে রাজশেখর রেড্ডি র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিল সিপিএম। বলেছিল এই প্রকল্প পরিবেশের ক্ষতি করবে। অথচ পশ্চি মবঙ্গের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা নিশ্চু প। তবে কি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অন্য রাজ্যে ক্ষতিকর হলেও পশ্চি মবঙ্গে তা স্বাস্থ্যকর? এই সীতারাম ইয়েচুরি এখন বলছেন, 'আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ১৯৯৫ সালে যখন আমরা বিপদে পড়েছিলাম তখন তারাপুরে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ করেছিল চীনই।' তবে কি চীনা জ্বালানির বাজারের জন্যই কি হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য এত লম্ফঝম্ফ? পশ্চি মবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানা কাজকর্মে ইতিমধ্যে চীনা প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যদিও যে প্রযুক্তির নানা অসঙ্গতি ও ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। তবুও চীনকে সাহায্য করতে পশ্চি মবঙ্গ সরকারের নানা কৌশল আজ চোখে পড়ছে।

হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তেজষ্ক্রিয় দূষণের সূতিকাগার

নবকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি পরমাণু বিদ্যুতের মায়া ত্যাগ করলেও ভারতের মতো দেশে আরম্ভ হয়েছে সে প্রযুক্তি দিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা। পশ্চি মবঙ্গের হরিপুরে যার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। সকলেরই মনে আছে

"পশ্চি মের দেশগুলো পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৮০ সালে সুইডেনের নাগরিকেরা ২০১০-এর মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক চুল্লী বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকা এই প্রকল্প বাতিল করেছে। ফলে এই প্রকল্পে আর কারও আগ্রহ নেই। তবে আমাদের দেশেই বা কেন?"

অভিশপ্ত ২৬ এপ্রিল '৮৬-এর ঠিক পরেই চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের হতভাগ্য অবস্থা।

অনুরূপ এক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্য সরকার এর পূর্বে গঙ্গাসাগরের কাছে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে স্থানের জনসাধারণের প্রবল আপত্তিতে এবং বিশেষজ্ঞদের আপত্তির কারণে সে পরিকল্পনা বাতিল হয়। বর্তমানে হরিপুরে এই ধরনের এক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে হরিপুর ও জুনপুট অঞ্চ লের মানুষেরা এই বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। এলাকার সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভা উপনির্বাচনের সময় তৃণমূল ও সিপিএম দু'দলের কাছেই ছিল এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইস্যু। কিন্তু দু'দলের স্থানীয় নেতারা এর বিরুদ্ধেই মত দিয়েছেন। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এখন প্রশ্ন, জনগণের আপত্তি সত্ত্বেও কেন এসব জনবসতি অঞ্চ লে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বসাবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে? সরকারি আইন অনুসারে গাইডলাইন হচ্ছে—পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও জনবসতি থাকাবে না অথচ পূর্ব মেদিনীপুরের এই অঞ্চ ল ঘনবসতিপূর্ণ। আইন অনুসারে কয়লাখনির ৭৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না—অথচ পূর্ব মেদিনীপুরের নিকটেই আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও ঝাড়খণ্ডের কয়লাখনিগুলি।

পরমাণু চুল্লীতে জ্বালানি হিসেবে লাগে ইউরেনিয়াম। খনি থেকে যে ইউরেনিয়াম মেলে তাকে জ্বালানির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পরিশোধন করতে হয়। পরিশোধনের সময় যে বর্জ্য মেলে তাতে থাকে রেডিয়াম ২২৬ ও থোরিয়াম ২৩০। দুটোই তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ফেলে দেওয়া থোরিয়ামের ক্ষমতা পুরোটা নয়, অর্ধনিস্ক্রিয় হতে সময় লাগে ৭৬ হাজার বছর। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে মানুষ ক্যানসার আক্রান্ত হয়, পরবর্তী প্রজন্ম শারীরিক ও মানসিক বিকৃত হয়ে জন্মায়। হরিপুরে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে মানুষের জীবনের গড় আয়ু একশো বছর ধরলে পরবর্তী ৭৬০টি প্রজন্ম এলাকার তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ বহন করবে। আমরা যারা কলকাতা, দুর্গাপুর, মালদা,-কৃষ্ণনগর বা শিলিগুড়িতে রয়েছি তারা হয়তো ভাবছি, আমাদের আর এমন কী ক্ষতি হবে! উদাহরণ হল, রাশিয়ার চেরনোবিলের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যখন বিস্ফোরণ হয়, তখন রাশিয়া খবরটা চেপে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুইডেনের বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান মিলতেই সব জানাজানি হয়ে যায়। তাই যারা হরিপুর থেকে অনেক দূরে রয়েছি বলে নিজেদের বিপদমুক্ত বলে মনে করছেন, তারা নিশ্চি ত মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। পারমাণবিক পদ্ধ তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন মানবসমাজকে ধ্বংসের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আজ বাতাসে মিশছে নানা ধরণের বিষ, গরম হয়ে উঠেছে পৃথিবী, গলছে বরফ, ফুলে উঠছে সমুদ্র। কোপেনহেগেনে এর থেকে মুক্তি পেতে ভাবা হয়েছে নানা উপায়। অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কোনও রাষ্ট্রনেতার মৃত্যু হয়নি, সেখানে মারা গেছেন হাসিম শেখ, রামা কৈবর্তের মতো হাজার হাজার মানুষ। তাই রাষ্ট্র-নেতারা এসব নিয়ে চিন্তা করতেও প্রস্তুত নন।

পরমাণু চুল্লীতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে সরকারি মহল উড়িয়ে দিলেও বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাগুলির দিকে নজর দিলেই প্রকৃত তথ্য মিলবে। সোভিয়েত রাশিয়ায় চেরনোবিলে অত্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল রাত ১ টায় দুর্ঘটনার ফলে প্রচণ্ড তাপে ২০০০ টন ভারী লোহা কংক্রিটের আচ্ছাদন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু রাশিয়ায় নয় তেজষ্ক্রিয়তার প্রভাব হাওয়ার মাধ্যমে ভেসে গিয়ে পার্শ্ববর্তীদেশ সুইডেন, হাঙ্গেরি সহ ২০টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৯৬ পর্যন্ত রাশিয়ায় কেবল ৩২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। বেসরকারী মতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ এর ফলে মারা যান। এই মৃত্যুর মিছিল এখনও চলছে। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে জানা যায় ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ১৫টি দেশে ১৫১টি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৬ সালে শুধুমাত্র পশ্চি ম জার্মানিতে ১৩৯টি দুর্ঘটনার খবর জানা যাচ্ছে। আমেরিকার এক সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে—সেদেশের বাণিজ্যিক পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে ১৯৮৬ সালে ২৮৩৬টি এবং পরের বছর ২৮১০টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের পরমাণু কেন্দ্রের বিস্ফোরণের সংবাদ সবারই জানা রয়েছে। ভারতের পরমাণু বিশেষজ্ঞ বীরেন্দ্র শর্মা ১৯৮৯ সালে এক সেমিনারে বলেছিলেন, ভারতের পরমাণু কেন্দ্র-গুলিতে কমপক্ষে ৩০০টি ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এর ফলে তিন হাজারের বেশি ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী তেজস্ক্রিয়তার শিকার হন। আমাদের দেশে যে কয়টি পরমাণু চুল্লি রয়েছে তারাপুর তার অন্যতম। এই তারাপুরে যেখানে ২৫০ জন কর্মী দিয়ে রি-অ্যাক্টার প্ল্যান চালানোর কথা, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সেখানে ১৩০০ কর্মী বদলাতে হয়েছে তাদের শরীরে তেজস্ক্রিয়তার মান অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৮০ সালে পাইপ ফুটো হয়ে পরমাণু চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে যাওয়ার খবর পি টি আই প্রকাশ করলেও, পারমাণবিক দপ্তর থেকে তা ছোটখাট ব্যাপার বলে ধামাচাপা দেওয়া হয়। এর পূর্বে ১৯৭২ সালে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার তারাপুরে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। এই দুই ইঞ্জিনিয়ার

(এরপর ১৩ পাতায়)

যুযুধান রাজনৈতিক দু'পক্ষ ও পরিবেশ সঙ্কট

হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প

"বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবহণের সময় প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর নামে যে প্রায় ৫০ শতাংশ বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটে, সেটাকে আটকাতে পারলে আমাদের দেশে আর বিদ্যুতের অভাব হবে না।" চেরনোবিল ঠেকে শিখেছে, সেটা দেখেও কি আমরা শিখব না?

অর্ণব নাগ

কিছুদিন আগেই একটি দৈনিক পত্রিকায় সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রাক্তন বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ নাম না করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছিলেন এই বলে যে—"বুদ্ধি জীবী ও পরিবেশ রক্ষার ঠিকাদারগণ ধরেই নিয়েছেন, এখানে (হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে) আর একটি নন্দীগ্রাম কিংবা সিঙ্গুর হবে। ভারতের অন্যত্র কী হচ্ছে, তা নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামাতে চান না।" এই উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি, 'তিনি' অর্থাৎ 'পরিবেশ বিপ্লবী' সুভাষ দত্ত সটান জবাবটা দিয়ে দিলেন 'স্বস্তিকা'-কে। জবাবটা এইরকম—"উনি 'ঠিকাদার' শব্দটা ব্যবহার করে 'পরিবেশ' কথাটাকেই আসলে খাটো করলেন। আমরা তো সাহা ইনস্টিটিউটের মতো সম্মানীয় প্রতিষ্ঠানে যাঁরা পড়ান তাদের একটু অন্য চোখে দেখি। কিন্তু তাঁর ভাষায় ও লেখায় সেই ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও শোভনতার কোনও নাম-গন্ধ পেলাম না।"

বলা বাহুল্য, হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে বিকাশ সিংহের সঙ্গে মোটেই একমত হচ্ছেন না 'পরিবেশ-আইনজীবী' সুভাষ দত্ত। তবে সমস্যাটি কেবল হরিপুর নিয়ে নয়, ভূ-ভারতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর কোনও যৌক্তিকতাই খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বিকাশ সিংহের 'আক্ষেপ'—দুনিয়া এগোচ্ছে, আমরা সেই তিমিরে; এই 'হা-হুতাশে'র মাঝে সুভাষবাবু 'দুনিয়া এগোনো'র নমুনা হিসেবে 'কটাক্ষ-পেশ' করছেন 'চেরনোবিল' প্রসঙ্গ টেনে এনে। ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল অধুনা ইউক্রেন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ানের চেরনোবিলে নিউক্লিয়ার প্লান্ট থেকে দুর্ঘটনা বশত তেজস্ক্রিয় বিষ নির্গত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষকে। অকুস্থল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন ৩ লক্ষ ৩৬

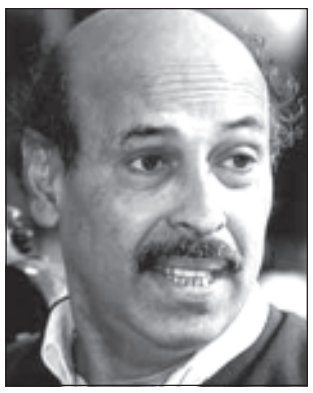

সুভাষ দত্ত

হাজার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, হিরোসিমার তুলনায় নাকি চারশো গুণ বেশি তেজস্ক্রিয় নির্গমণ হয়েছিল সেখানে। বহু পঙ্গু, অসহায় ক্যান্সার গ্রস্ত নর-নারীকে নিয়ে আজও সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি বহন করছে চেরনোবিল। কয়লা পোড়ালে দূষণ হবে—সর্বজনমান্য এই থিওরি-র ক্ষেত্রে কোনও 'ব্যতিক্রমী ভাবনা'র শরিক না হয়েও সুভাষবাবু এর 'বিকল্প' হিসেবে পরমাণু বিদ্যুৎ-কে একদমই ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। বরঞ্চ বিকল্প শক্তির সন্ধানে পুনর্ণবীকরণ শক্তি (যার মধ্যে গোরু থেকে প্রাপ্ত গোবর গ্যাসও আছে) এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তিসমূহের (যেমন বায়ু শক্তি) কথা বলেছেন। সুভাষবাবুর আশঙ্কা—'রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যে সেফটি সিকুইরিটি মেজার্স সঠিকভাবে বিচার্য হয় না।' আর সরাসরি 'বিকাশবাবুদের' উদ্দেশ্যে তোপ দেগে বলেছেন—"যে সমস্ত বিজ্ঞানী আর আমলারা এর মধ্যে ভবিষ্যতের কোনও বিপদ আঁচ করতে পারছেন না, তাঁরা বরং ওই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে নিজেদের ঘরবাড়ি করুন।"

সুভাষবাবুর সঙ্গে একশ' শতাংশ একমত হচ্ছেন বিধাননগর কলেজের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান অশোকেন্দু সেনগুপ্ত। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর মতে আবশ্যিক শর্ত হলো দু'টি। প্রথমত—লোকালয় থেকে দূরে প্রচুর জমি দরকার। দ্বিতীয়ত, প্রভূত জলের প্রয়োজন, কাছে সমুদ্র ও নদী থাকা বাঞ্ছনীয়। আপাতভাবে হরিপুরে সরকার এই দু'টো শর্তই পূরণ করছে বলে

লক্ষ্মণ শেঠ

মনে হলেও বিষয়টি আদপেই তা নয়। কারণ—প্রথমত, সেখানে রয়েছে জনঘনবসতি (যদিও এই তত্ত্বটিকে বেমালুম অস্বীকার করেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের 'রাজ্য খোয়ানো রাজা' লক্ষণ শেঠ), দ্বিতীয়ত অশোকেন্দুবাবুর মতে, ওখানে প্রচুর জল থাকলেও তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে বহু মৎস্যজীবীর ভাগ্য। বিকাশবাবু যেমন তাঁর লেখনীতে এই বিষয়টিকে 'পাগলের প্রলাপ' বলেছেন কিন্তু অশোকেন্দুবাবু মনে করছেন, 'বিকাশ সিংহে'র উদাহরণ (কলপক্কম) অনুযায়ী 'পরমাণু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে'র মাছ সুস্বাদু হতে পারে কিন্তু হাই সিকিওরিটি জোন হবার সুবাদে (যদি সেখানে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়) ওখানে প্রবেশ করার সুযোগই পাবেন না মৎস্যজীবীরা। প্রকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে কর্মসংস্থানের 'স্বপ্ন' (৫ থেকে ৭ হাজার কর্মসংস্থান) দেখিয়েছিলেন বিকাশবাবু, তাকেও নস্যাৎ করে অশোকেন্দুবাবু বলছেন—'হাইলি সফিস্টিকেটেড ইউনিটে অত কর্মসংস্থানের প্রশ্নই নেই।' এমনকী পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্বপক্ষে একমাত্র জোরাল যুক্তি 'এতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয় না'—এটাকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন শ্রী সেনগুপ্ত। তিনি বলছেন—'পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে টার্বাইনে জল গরম হয়ে তা সমুদ্রে পড়বে। এতে উষ্ণ হবে সমুদ্রের জল। সুতরাং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

ঘনজনবসতি'র যে তত্ত্ব অশোকেন্দুবাবু দিয়েছেন তা একমাত্র লক্ষণবাবু ও তাঁর পার্টি ছাড়া সমর্থিত হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক এবং পরিবেশবিদদের দ্বারা। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ কল্যাণ রুদ্র মনে করছেন—'একে উপকূলীয় এলাকা, তার ওপরে ৩০ কি.মি. ব্যাসার্ধ জুড়ে ঘনবসতি এলাকা, সেইসাথে ওখানে ফিশিং জোন রয়েছে; ৩০০ কিমি দূরে কাঁথি উপকূলীয় এলাকা থেকে মাছ আসে এখানে। সুতরাং হরিপুরে পরমাণু কেন্দ্র গড়ে তোলা সত্যিই বিপজ্জনক।' উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছেন যে সুন্দরবন বায়োস্ফীয়ার রিজার্ভ যে বিপদের মধ্যে পড়েছে হরিপুরে সত্যি সত্যিই পরমাণু কেন্দ্র হলে তার হালও ওরকম হবে। শুধুমাত্র 'হরিপুরে'র ওপর ফোকাস করে কল্যাণবাবুর মন্তব্য—"এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ব্যাহত হবে, স্বাদু জলের উৎসে ব্যাঘাত ঘটবে।" সাহা ইনস্টিটিউটের পদার্থ বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদারেরও অভিমত—হরিপুর কেন, কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়া উচিত নয়।

বিজ্ঞানীকূলের মতভেদটুকু ধরে নিয়ে সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম যে স্রোতে গা ভাসিয়েছিল, হরিপুরও সেই পথের অনুসারী। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলে 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে দু'পক্ষের। যে কারণে হম্বিতম্বি ছেড়ে 'একদা' পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 'মুকুটহীন সম্রাট' লক্ষণ শেঠ 'স্বস্তিকা'কে জানিয়েছেন, মানুষ না চাইলে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প হবে না। তবে সেইসঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি—মানুষকে ভুল বোঝানোর যে 'তৃণমূলী চক্রান্ত' চলছে তা আটকাতে যথাসাধ্য 'চেষ্টা' করবেন তাঁরা। অন্যদিকে

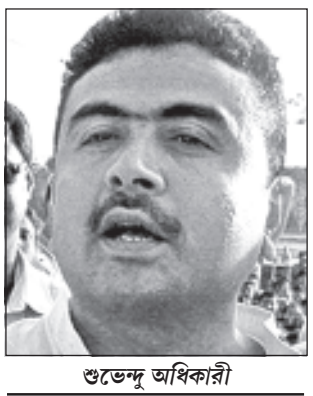

শুভেন্দু অধিকারী

লক্ষণবাবুর 'খোয়া যাওয়া মুকুট' এই মুহূর্তে যাঁর শিরে সেই তমলুকের সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী জনগণের আদেশ 'শিরোধার্য' করেই বলছেন—"প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে গিয়ে যা খুশি বলুন আর মুখ্যমন্ত্রী রাইটার্সে বসে যা ইচ্ছে তাই বলুন না কেন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে হলে তাঁদের আসতে হবে তো হরিপুরেই। সেখানে তাঁরা জনপ্রতিরোধের মুখে পড়বেন।" তাঁর এই 'আত্মপ্রত্যয়' আরও বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লীর সংসদভবন। কারণ স্রেফ দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীই নয়, সবশুদ্ধ গোটা কুড়ি সাংসদ নিয়ে হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে 'হাড় কাঁপিয়ে' দিয়েছিলেন সংসদভবনের। লক্ষণবাবুর 'স্বস্তিকা'কে দেওয়া বক্তব্য আর তার পরে গত ৭ই জানুয়ারী সিপিএমের রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পর এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় বলে দায় এড়াবে রাজ্য। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে। প্রথম 'পাখী'—সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের পর আর 'একসারি'-তে হরিপুরের নাম উচ্চারিত হবে না এবং 'দ্বিতীয় পাখী'—প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি, 'হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে', এই সূত্র ধরে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিকের মধ্যে 'রাজনৈতিক ফাটল' ধরানো সম্ভবপর হবে।

যদিও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের আরেক কান্ডারী অধুনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পূর্ব মেদিনীপুরেরই সাংসদ শিশির অধিকারী বলছেন—"সিঙ্গুর আন্দোলনের কয়েক-মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন। আসলে এমন দুর্বল, অপরিণামদর্শী, হীনমন্য, অহঙ্কারী সরকার আগে আসেনি। তাই এত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।" তবে আপাতত শিশিরবাবু পরোক্ষ দর্শকের ভূমিকায় সমস্ত ব্যাপারটিকে 'অবলোকন' করছেন। কারণ 'মন্ত্রীর একটা শিষ্টাচার (উনি বললেন এথিক্স্) আছে'—এই জিনিসটা তাঁর মাথায় রয়েছে।

স্বনামখ্যাত বাবার (শিশির অধিকারী) ছেলে এবং স্বনামখ্যাত দাদার (শুভেন্দু অধিকারী) ভাই হওয়ায় সুবাদে এবং তারপরে 'যত কাণ্ড হরিপুরে'-র বিধায়ক হবার দৌলতে দিব্যেন্দু অধিকারী পুরো ব্যাপারটাতেই খুব 'চাপে' রয়েছেন। তাঁর সাথে কথা বললেই এটা টের পাওয়া যাবে। আপাতত 'মানুষের না চাওয়া' এবং 'গণ আন্দোলন' নিয়েই স্বস্তিকার সাক্ষাৎকারে সরব হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতি রঞ্জিত মণ্ডল এবং সহ-সভাধিপতি মামুদ হুসেন দুজনেই 'কাঁথির অধিকারীবাড়ির বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা'র ওপরেই আস্থা রাখছেন। জমি অধিগ্রহণকেই হরিপুর কাণ্ডে অগ্রাধিকার দিয়ে রঞ্জিত মণ্ডলের বক্তব্য—"জমি অধিগ্রহণ হয়তো কিছু জায়গায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেখানে অসাধু ব্যবসায়ীকে লিজ দিয়ে জমি ফেলে রেখেছে রাজ্য। এতে ক্ষতি হচ্ছে জনসাধারণের। হরিপুর থেকে মাত্র ৬০ কিমি দূরে দীঘা-জুনপুট-পেটোয়া এলাকার মৎস্যজীবীদের ক্ষতি করতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার।" আর মামুদের বক্তব্য—"পতিত, অনুর্বর জমিতে যা ইচ্ছে করুক সরকার, কিন্তু হরিপুরের তিন ফসলী জমিতে নয়।"

বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদেরা চিন্তিত ঘন জনবসতি এলাকা ও মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্ধারণের সম্বল, বঙ্গোপসাগরের এলাকায় যার নাম হরিপুর, সেখানে পরমাণুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে। আর জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে রাজ্যে 'জমি হারানো' সিপিএম এবং জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে 'পায়ের তলায় মাটি পাওয়া' বিরোধীদের হরিপুরের তরজার একমাত্র ইস্যু সেই 'জমি অধিগ্রহণ'ই। বিরোধীদের হিসেবে অন্তত ১৫ থেকে ২০ হাজার পাট্টাদার বাস করেন ওখানে। শিল্পায়নের প্রশ্নে কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

শিশির অধিকারী

হওয়া উচিত কিনা তা বিচারের ভার তাঁরা ছাড়তে চান পরিবেশবিদদের ওপরেই। তবে 'স্বস্তিকা'র পাতায় পরিবেশবিদদের ভাবনা নিঃসন্দেহে খুশি করবে শুভেন্দুবাবু-শিশিরবাবুদের। হরিপুর এলাকায় 'মৎস্যজীবীদের জীবিকা' এবং 'জমি অধিগ্রহণে'র মধ্যে শাসক-বিরোধীদের রাজনীতির খেলা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পরিবেশবিদদের সতর্কবাণী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এড়াবেন কিভাবে? অশোকেন্দুবাবু একটা খাঁটি কথা বলেছেন—"বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবহণের সময় প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর নামে যে প্রায় ৫০ শতাংশ বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটে, সেটাকে আটকাতে পারলে আমাদের দেশে আর বিদ্যুতের অভাব হবে না।" চেরনোবিল ঠেকে শিখেছে, সেটা দেখেও কি আমরা শিখব না?

রাজা প্রতাপচাঁদ

'বিচিত্র খবর...' কলামে/স্বস্তিকা, ৯।১১।০৯ নির্মল কর বলেছেন— বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদকে আদালতে তাঁর কানের কাটা দাগ দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, তিনি 'আসল' প্রতাপচাঁদ, এবং কানের ওই কাটা দাগই তাঁকে রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল। কথাটি ঠিক নয়। আদালতে শুনানিকালে ডাঃ হালিডে এবং ডাঃ স্কট প্রতাপচাঁদের উরুতে এবং গালের ভিতরে অস্ত্রোপচারজনিত দাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, কানের কাটা দাগের কথা কেহ উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, সাধারণ বিবেচনা বলবে, কানের সামান্য একটি কাটা দাগ ব্যক্তি-পরিচয়ের নিশ্চি ত প্রমাণ হতে পারে না;বিশেষ করে আদালতে। আদালত তাঁকে 'প্রতাপচাঁদ' বলে মানেনি; ফলে তিনি রাজ্য পাননি।

মৃত্যুর আট-দশ মাস আগে প্রতাপচাঁদ কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে এসে থেকেছিলেন। ১৮৫২ সালে কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গ া পল্লীতে একটি সাধারণ বাড়িতে নির্বান্ধব অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। রাজা প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে নিদেনপক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল-প্রতাপচাঁদ' পুস্তকটির পাতা ওল্ট াতে হবে।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

"বিচার ব্যবস্থা"

কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলিম জঙ্গিদের আক্রমণে কোয়েম্বাতুরে ৫০ জন নিরীহ ভারতীয় নিহত হন। ওই ঘটনায় ষড়যন্ত্র ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভিযোগে পুলিশ ৪৩ জন মুসলিম মৌলবাদীকে গ্রেপ্তার করার চার্জশীট দেয়, তার মধ্যে নিম্ন আদালত ২১ জনকে রেহাই দেন এবং ২২ জনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনায়। গত ১৭ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে র দুই বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করেন, ২২ জন মুসলিম মৌলবাদীকে রেহাই দেন। এতে নিহত ও আহতদের আত্মীয়স্বজনের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক আমাদের সরকারী উকিলবাবুরা কি পেট্রোডলারের মহিমায় মামলাগুলো ঠিকমত মাননীয় বিচারপতিদের নিকট ঠিক মতো প্লেস করছেন না?

রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪

ভদ্র (?) আনিসুর ও সেলিম

যতদূর সালটা মনে না পড়লেও বামফ্রন্টের কোনও একজন, এক বিশিষ্ট কণ্ঠসংগীত শিল্পী ঊষা উত্থুপ-এর গানকে অপসংস্কৃতি বলেছিলেন। তাই অধুনা ভগ্নপ্রায় বামফ্রন্টের শরিক সিপিএমের তাবড় তাবড় পোষাক পরিচ্ছদে অ-ভদ্রলোকগুলি যেভাবে এক মহিলা সাংসদকে কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করে বলেছেন সেটা অধমেরও অধম।

কোনও এক জেলা সম্মেলনে তৃণমূলকে খচ্চরের পার্টি ও মমতাকে খচ্চর বলা হয়েছে যাতে কোনো সভ্য-রাজ্যের মন্ত্রী বা সাংসদের সভ্যতা ভদ্রতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বোধহয়। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরলেই যে সভ্য হওয়া যায় না তা ওই মন্ত্রী ও সাংসদের বক্তব্যই যথেষ্ট।

অবশ্য যারা সমাজ-বিরোধী পোষেন, হার্মাদ উৎপাদন করেন, তাদের মুখেই বোধহয় এইসব বিশেষণ মানায়। ওইরকম বিশ্রীভাবে, জাত তুলে কথা-বার্তা কোনও মনুষ্যরূপী জানোয়ারও বলে না। এঁরা বোধহয় তারও অধম। বিনয় কোঙারসহ সিপিএমের নেতারা যেভাবে এক ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে

অশালীন মন্তব্য করে গেছেন ও যাচ্ছেন তা পশ্চি মবঙ্গের এই জঙ্গলের রাজত্বেই সম্ভব। এরা জনগণকে সম্মান জানাতে জানে না, মহিলাকে সম্ভ্রম করতে জানে না। শুধু জানে ধর্ষণ আর হনন।

সাংসদ বলেছেন সিঙ্গুরে মমতা অনশন-এর নাম করে মঞ্চে র পিছনে শৌচাগারের মধ্যে রাখা ফলের রস পান করে অনশন করেছেন। ওই মন্ত্রী আনিসুর রহমানের কী হীন মনোবৃত্তি!

মহিলাদের শৌচাগারে উঁকি দেওয়া বা মহিলাদের উদ্দেশ্যে ন্যক্কারজনক উক্তি করা কোনও বিশেষ ধরনের ব্যক্তিরাই পারে।

আপাতদৃষ্টিতে ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবীতে ভদ্রলোককে ভদ্র মনে হলেও তিনি বলেছেন, তৃণমূলনেত্রী ভাগ্যিস কোনও সন্তানের জন্ম দেননি এখনও। সেলিমের ওই মহিলাদের সংস্পর্শে আসার কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি? যাইহোক, ভদ্রলোক যে পোষাক বা গায়ে লেখা থাকে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ আনিসুর রহমান ও সেলিম।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান

সংখ্যালঘু তোষণের বিষময় ফল

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

"কিশোরীকে ট্রেন থেকে টেনে নামাল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা (একদিন, ১০ নভেম্বর) সংবাদ পাঠ করে স্তম্ভিত হতে হল। ঘটনাটি ঘটেছে রাত্রি ১০-৩০টা নাগাদ পার্ক সার্কাস রেল স্টেশনের বাইরে। শিয়ালদহগামী ট্রেনটি সিগ্‌নাল না পাওয়ার জন্য স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে যায়। সম্ভবত, ৪ নম্বর ব্রীজের নিচেই। এই সুযোগে কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহিলা কামরায় উঠে পড়ে কয়েকজনকে টেনে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ট্রেনটি সিগ্‌নাল পেয়ে চলতে শুরু করলে দুষ্কৃতীরা লাফিয়ে নেমে পড়ে, তবে একজন কিশোরীকে টেনে নামাতে সক্ষম হয়। পার্ক সার্কাস, তিলজলা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। ওই দুষ্কৃতীরাও সবাই মুসলমান। কিন্তু এদের এত ঔদ্ধ ত্য সাহস এবং স্পর্ধার কারণ কি? কারণ এই যে মুসলিম ভোটের কাঙ্গাল রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমাগত তোষণে এরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাই যা ইচ্ছে তাই-ই করে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে তো অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে কে কত বেশি এদের তোয়াজ করে এদের মন জয় করতে পারবে। কেউ মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি, দিচ্ছে, কেউ বা মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ধাঁচে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মুসলিম ইউনিভার্সিটি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অন্য কেউ চাকরী এবং শিক্ষায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের অঙ্গ ীকার করছে। এর সঙ্গে আছে কিছু মৌলানা-মৌলভি এবং ইমাম সাহেবের উস্কানি মূলক বক্তৃতা। ফলে ওই সমস্ত মুসলমান দুষ্কৃতীরা অসমসাহসী হয়ে উঠে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, খুন, অপহরণ ধর্ষণ প্রভৃতিতে লিপ্ত মুসলমান দুষ্কৃতীদের পুলিশ ধরে না। কারণ তারা জানে ওপর থেকে নির্দেশ আসবে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ওপরওয়ালাদের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পুলিশ কর্মীদের তো বটেই উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদেরও নেই। তাই অনর্থক ঝামেলায় নিজেদের না জড়িয়ে তারা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারই করে না।

জ ন ম ত

ফলে অপরাধীদের কোনও সাজা হয় না। বুক ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়। এতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে মুসলিম যুবকেরা। তারাও সাহসী বেপরোয়া হয়ে উঠে নিজেদের রিরংসা চরিতার্থ করতে চায়। বাধা পেলে খুন করতেও পিছ্‌পা হয় না। তাই দিন কে দিন খুন, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়েই চলেছে। এই তো মাত্র কিছুদিন আগেই মেটিয়াব্রুজ অঞ্চ লে প্রকাশ্য রাজপথে সকাল ১০টা-১১টার সময় স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া একটি টাটাসুমো গাড়ী থামিয়ে একটি মেয়েকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল মোটর সাইকেলে করে আসা তিন মুসলিম দুষ্কৃতী। বাধা পেয়ে গাড়ীর ড্রাইভারকে গুলি করতেও দ্বিধা করেনি ওই দুষ্কৃতীরা। তারপর এই চলন্ত ট্রেন থেকে কিশোরী অপহরণের ঘটনা। এতদিন এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চি মবঙ্গের গ্রামাঞ্চ লে ঘটছিল। এখন খোদ কলকাতা শহরে ঘটছে এবং নিঃসন্দেহ বলা যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলি এবং বুদ্ধি জীবীরা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়, জঙ্গলমহল এমন কী রিজওয়ানুর রহমানের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়েও সরব হন, শোক মিছিল করেন, কিন্তু মুসলমানদের এই গগনচু ম্বী ঔদ্ধ ত্যের বিষয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকেন। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন না পাছে লোকে সাম্প্রদায়িক বলে। লোকে সাম্প্রদায়িক বলবে? না, না ছিঃ ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা। তার চেয়ে মুসলমানরা যা করছে করুক। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে এসে ব্যাঙ্ককর্মী খুন করছে? পুলিশ আছে তো। তারা তদন্ত করবে। হিন্দু মেয়েদের উত্ত্যক্ত করছে, অপহরণ করছে ধর্ষণ আছে। কিন্তু প্রশ্ন ওই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচিত্র পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী, ভাগনী, ভাইঝি, বোনঝি-সহ অন্যান্য আত্মীয়ারা যখন মুসলমান, দুষ্কৃতীদের দ্বারা অপহৃতা নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা এবং গণধর্ষণের শিকার হবে তখনও কি তাঁরা নির্বাক থাকবেন? এই সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে সরব হবেন না?

আসলে আমরা বাঙালীরা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখসর্বস্ব, আত্মমুখী। সোজা কথায় স্বার্থপর। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছি ততক্ষণই আমরা উদার মহৎ, ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন আমাদের মহত্ত্ব উদারতার মুখোসটা খসে পড়ে, আসল রূপটা প্রকাশ পায়। কিন্তু ততক্ষণ যা হওয়ার তা হয়ে যায়, আর কিছু করার থাকে না। এটা আমরা কবে উপলব্ধি করব?

নবদ্বীপে সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন

খগেন্দ্রনাথ-ঊর্মিলাদেবী স্মৃতিভবন-আগমেশ্বরীপাড়ায় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান প্রবর্তিত ও নবদ্বীপ সংস্কৃত পরিষদ্ পরিচালিত সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের তৃতীয় দীক্ষার উদ্‌বোধন হল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বৃন্দাবনধর গোস্বামী ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ শান্তিময় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গ লাচরণ করে শিক্ষার্থী পিংকু রাজবংশী। স্বাগত ভাষণ দেন সংযোজক ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনা করে শিক্ষার্থী শ্যামল দেবনাথ। সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উ পযোগিতা বর্ণনা করেন শ্যামবিনোদিনী কুঞ্জের প্রশিক্ষক জীবন দেবনাথ ও অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য।

পরিশেষে সমবেত ঐক্যমন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

মালদায় রাষ্ট্ররক্ষা শিবির

গত ২ জানুয়ারী শেষ হল মালদা বিভাগের শীতকালীন শিবির। 'রাষ্ট্ররক্ষা মহাশিবির' হিসাবে শিবিরটির নাম দেওয়া হয়েছিল। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ সত্ত্বেও সঙ্ঘের কার্যক্রমের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ২৬ ডিসেম্বর থেকে মালদা বিভাগের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা শিবির ফরাক্কা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ও মালদার সাহাপুর হাইস্কুলে রাষ্ট্ররক্ষা মহাশিবির শুরু হয়। তিন রাত্রি ও দুই দিনের এই শিবিরে ফরাক্কাতে ৬৮ জন এবং সাহাপুরে ৩৯০ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করে। মালদা বিভাগের শেষ শীত শিবির অনুষ্ঠিত হয় চাঁচলের অনুপনগর হাইস্কুলে। সেখানে ১২৬ জন স্বয়ংসেবক যোগাসন, সূর্যনমস্কার, ব্যায়াম

যোগ, খো-খো, কবাডি খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই সকল শিবিরে অনেক নতুন স্বয়ংসেবক এসেছিল যারা পরবর্তীতে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাষ্ট্রসেবায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। রাষ্ট্ররক্ষা মহাশিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রনেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার ও অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ উপস্থিত থেকে স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করেন। সাহাপুর শিবিরে থেকে পথসঞ্চ লন বের হয়ে মালদার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

পরম্পরা

সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

বেদে সরস্বতী যেমন দেবতার নাম তেমনি নদীর নামও। যাস্ক লিখেছেন—সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি। সরস্বতী কথাটি নদী এবং দেবতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নদী। যাস্কের মতে সরঃ বা সরস্ অর্থ জল। জল যার রয়েছে সে সরস্বতী অর্থাৎ সরস্বতী। ঋগ্বেদ সংহিতায় জল অর্থে সরস্ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। পরে পরে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে সরস্ শব্দের অর্থ বদলেছে। অনুমান করা হয় তখন থেকেই সরস্শব্দ জ্যোতি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেজন্য সরস্বতীরও অর্থ হয়েছে জ্যোতির্ময়ী। ঋষিরাই বলেছেন, সরঃ অর্থে জল এবং সে কারণেই সরস্বতীর প্রথম অর্থ জল বা নদী। আর্যাবর্তে প্রবাহিতা নদী সরস্বতীই পূজিতা হতেন প্রথমে দেবীরূপে। বেদের যুগে সরস্বতী ছিল প্রধানা পবিত্র নদী, গঙ্গার স্থান ছিল তার পরে। গঙ্গার মতো পরম পবিত্র সরস্বতী ছিল সনাতন হিন্দুদের ধ্যেয়। তারপর একদা সেই নদী হলেন দেবী। জলদাত্রী থেকে জ্ঞানদাত্রী। জলই জীবন। জ্ঞান সেই জীবন প্রবাহের সজীব রূপ। বেদের ঋষির অন্তর্দৃষ্টিতে নদী সরস্বতী হলেন বাক্‌দেবী। তিনি আবার অগ্নির ত্রিমূর্তি—ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী। ঋষিরা তাই এই ত্রিমূর্তিকে আহ্বান করেছেন যজ্ঞের অগ্নিতে। সেই দেবীর আরাধনা করতে গিয়ে ঋষি দেখলেন—এই বাক্‌দেবীর ত্রিমূর্তি। ইনিই স্বর্গে ভারতী। ইনিই পৃথিবীর বাক্ ইলা আবার অন্তরীক্ষে এই বাক্‌দেবীই হলেন সরস্বতী।

একদিন এই সরস্বতী নদী তীরেই জ্বলে উঠেছিল ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি। বৈদিক যুগের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞের সঙ্গে সরস্বতীর সম্বন্ধ ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরে সুস্পষ্ট। যজ্ঞ দধে সরস্বতী—সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করেন। যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি এবং আহুতি মন্ত্রনির্ভর। মন্ত্রসমূহ আবার বাগাত্মক, সুতরাং বাক্‌ই যজ্ঞকে নির্বাহ করেন। বেদাধ্যায়নের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে (৯,৬৭,৩২)—পাবমানী, ঋক্‌সমূহ যিনি অধ্যয়ন করেন, তার জন্য সরস্বতী দোহন করেন দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জল।

প্রাচীন ইতিহাসের মতে যে স্থানে যজ্ঞ বা মন্ত্রধ্বনিত হতো সেখানেই গড়ে উঠত সভ্যতার পীঠভূমি। কিন্তু কোথায় সেই সরস্বতী? যার তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা। সরস্বতী কি সিন্ধু? অনেকে তাই মনে করেন। তাঁদের মতে সিন্ধু ও সরস্বতী অভিন্ন। অন্যমতে ইনি মধ্যদেশের দৃষদ্বতীর সহযোগী এবং কুরুক্ষেত্রের কাছে বিনশন প্রাপ্ত। পৌরাণিকের ধারণায়, সেই সরস্বতীই অন্তঃসলিলা হয়ে মিশেছে প্রয়াগে—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে। তাই প্রয়াগ ত্রিবেণীসঙ্গমে

।। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত।।

মহাতীর্থ স্বরূপ। প্রয়াগে অলক্ষ্যসরস্বতী আজও পূজিতা। প্রয়াগ শহর শিক্ষাসংস্কৃতি ও বেদ চর্চায় আজও সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম সরস্বতী ছিল। অথর্ব বেদেই (৬,১০০) তিনটি সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে। পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তার প্রবাহ ছিল—একথা ঋগ্বেদে রয়েছে। ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক উৎস থেকে সরস্বতী উৎপন্ন। সরস্বতী প্লক্ষপ্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। মাঝপথে মরুপ্রদেশে এই ধারা অন্তঃসলিলা হয়েছিল। ঋগ্বেদে রয়েছে সারস্বত সত্র নামে এক বিশেষ ধরণের সত্র এই নদীর গতিপথের সঙ্গে যুক্ত। 'সত্র'—একধরনের দীর্ঘদিনসাধ্য সোমযাগ। যাতে ব্রাহ্মণেরা যজমান এবং তাঁরাই ঋত্বিকের কাজ করতেন। সারস্বত সত্রের আরম্ভ হোত সরস্বতী বিনশনে। যেখানে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়, সেই স্থানের নাম সরস্বতী বিনশন (বিনাশঅদর্শন)। এই অনুষ্ঠান শুরুর পর কর্তৃপক্ষ নদীর দক্ষিণ তীর ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ শেষে একটি যজ্ঞীয় সামগ্রী সবলে দূরে নিক্ষেপ করতেন। যেখানে সেটি পড়তো তাই হোত পরবর্তী অনুষ্ঠানের স্থান। নদী তীরবর্তী অঞ্চল ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠত সভ্যতার পীঠস্থান। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সেকালে সরস্বতীই ছিল আর্যসংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র।

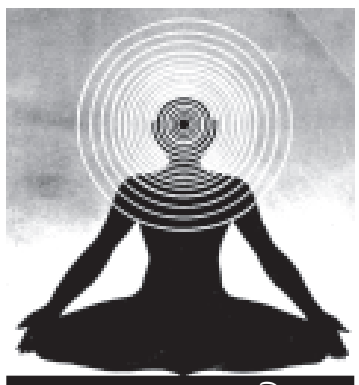

ভারতের শাশ্বত মনীষা

ভবদেব ভট্ট

চিরন্তন চক্রবর্তী।। ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা ও নিবন্ধরচয়িতা। সেই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আন্দোলন চলছিল। শঙ্করাচার্যের সময় থেকেই এই আন্দোলন আরম্ভ হলেও ভবদেবের সময় তা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। পাল সাম্রাজ্যে রাজকীয় ধর্ম পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মে পর্যবসিত হয়। এই বেদবিরুদ্ধ ধর্ম হিন্দুসমাজের মূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই সময় আমরা কেবলমাত্র ভবদেবকেই পাই যিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও অন্যান্য বিরোধী ধর্মগুলির বিপক্ষে হিন্দু আচার ও সংস্কার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে বিপর্যস্ত হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে জনগণের জীবনকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, তিনি হিন্দু আচার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে তৎকালীন আগ্রাসী বৌদ্ধ ধর্মকে বাধা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে ভবদেব হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়ে ধর্মের প্রমাণ হিসেবে পুরাণের প্রামাণ্য সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। সেজন্য দেখা যায় যে তিনি তাঁর 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' গ্রন্থে কোনও পুরাণ হতে কোনও উদ্ধৃতি গ্রহণ করেননি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে কেবলমাত্র মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। আবার তাঁর 'সম্বন্ধবিবেক' গ্রন্থে তিনি কেবলমাত্র বিষ্ণুপুরাণ থেকে তিন পংক্তি ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ থেকে একপংক্তি উল্লেখ করেছেন। শবসূতকাশৌচ প্রকরণে তিনি কেবলমাত্র মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে দেখা যায় যে তিনি পুরাণের প্রামাণ্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। সেজন্য পুরাণের উদ্ধৃতি কোনও গ্রন্থে একেবারেই গ্রহণ করেন নি। তবে স্মৃতিশাস্ত্র নিবন্ধকারদের মধ্যে ভবদেব এমন একজন নিবন্ধকার ছিলেন যাঁর প্রভাব সেই সময় সামাজিক জীবনে অত্যন্ত বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। আজও সেই প্রভাব মুছে যায়নি। কারণ ভবদেব রচিত 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি'তে নির্দেশিত রীতি অনুসারেই এখনও সামবেদীয় মানুষদের দশবিধ সংস্কার, যথা, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। বর্তমানে এ তিনটি সংস্কারই বহুল প্রচলিত।

শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, ভবদেব ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীন অস্পষ্ট ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় সেই সময়ের উপযোগী নতুন বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেন এবং স্মৃতি শাস্ত্রের যে সকল আচার সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিত তা সমূলে ধ্বংস করে স্বকীয় পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে অন্ধকার বিদূরিত করেছেন। তিনি ছিলেন নবীন হোরাশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা। তাঁর সমুদয় গ্রন্থ ভারতের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' 'শবসূতকাশৌচ প্রকরণ' 'সম্বন্ধ বিবেক' ও 'তৌতাতিত মততিলক' উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ব্যবহার তিলক' বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। ভবদেব ভট্ট সামবেদের কৌথুমশাখার অন্তর্গত সাবর্ণ গোত্রজাত শ্রেত্রিয় ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী রাজা হরিবর্মদেবের 'সন্ধিবিগ্রহিক' মন্ত্রী। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হতে ভবদেব ভট্টের গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

সে যুগের অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হিসেবে তিনি খ্যাত। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ, অদ্বৈত-বেদান্তে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, আবার অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতিতেও তাঁর জ্ঞানের সীমা ছিল না।

সনাতনী শিক্ষা

'কেন' উপনিষদের বাণী

তুমি যদি মনে কর যে আমি ভগবানকে জেনেছি, তাহলে জেনে রাখ যে ভগবানকে তুমি খুব অল্পই জেনেছ।

শ্লোক ১০

মূল সংস্কৃত শ্লোকঃ যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মনো রূপম্।

তাৎপর্য বিশ্লেষণঃ ভগবানের কার্যকলাপ দুই ভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে একটি ভাগে পড়ছে তাঁর নিয়ম মাফিক কার্যধারা গুলি। গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণন, প্রাণী দেহের নির্দিষ্ট গঠন ও কাজ, পরমাণুর ক্রিয়া, যন্ত্রের ক্রিয়া। এইগুলি সব ঐ নিয়ম মাফিক কর্মের মধ্যে পড়ছে। বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা দ্বারা ঈশ্বরের এই কাজগুলিকে আমরা কিছুটা জানতে পারি, বুঝতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের অপর আর এক ধরনের কার্যধারা রয়েছে যেগুলি সর্বদা নিয়ম মেনে চলে না। স্থানে স্থানে পরমেশ্বর- স্বেচ্ছাময়, নির্গুণ, নির্বিকার ভাবে কাজ করে চলেন। এইসব স্থানে তাঁকে বোঝা দুঃসাধ্য। প্রাণী শরীরের জিনের কোড এখনও সমস্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরমাণুর ভিতরেও সমস্ত কণার সঠিক অবস্থান ও কার্যধারা এখনও গভীর অতলেই রয়েছে। ভিনগ্রহের গঠন প্রকৃতি, মানবমনের জটিলতার হিসাব নিকেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রই আজও অধরা। বিভার নামক প্রাণীরা কেন দল বেঁধে আত্মহত্যা করে, কৃষ্ণসার মৃগ কিভাবে জল ছাড়া বেঁচে থাকে, আফ্রিকা, ব্রাজিল, বলিভিয়ার গহন অরণ্যে কি রয়েছে, সমুদ্রের গভীরে ঠিক কি কি ঘটনা ঘটে— এসবই আজও অজানা। তাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে ভগবানকে আমরা খুব অল্পই জেনেছি। অতএব আমরা যেন জ্ঞানের অহংকারে অত্যাধিক লিপ্ত না হয়ে পড়ি।

—রবীন সেনগুপ্ত

বোধ কথা

আলোর পথের পথিক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভগবান তথাগত নিয়মিত তাঁর শিষ্যদের নানা গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে সদুপদেশ দিতেন। একবার এক রাজামশায় সদুপদেশের পর বুদ্ধ দেবকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি বললেন, 'মহারাজ, একটু আগে আপনিই বলেছেন মানুষ চার রকমের হয়। একটু বুঝিয়ে বলুন।' ভগবান বুদ্ধ বললেন, "মানুষ চার প্রকারের। এক—অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে যায়, দুই—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে গমনকারী, তিন—আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাওয়া এবং চতুর্থ—আলো থেকে আরও উজ্জ্বল আলোর পথের যাত্রী।"

এরপর রাজামশাই-কে বুদ্ধ বললেন, "যদি কোনও মানুষ নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে আর আজীবন দুষ্কর্ম করে জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তাকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে যাওয়া বলে গণ্য করা হবে।

যদি কোনও মানুষ দীন-হীন হওয়া সত্ত্বেও, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কায়, মন ও বাক্যে সদ্ আচরণ করে তাহলে সেইরকম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথযাত্রী বলা হবে।

আর যদি কোনও মানুষ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, তার কোনওরকম অসুবিধা না থাকে, রূপবান ও বলবান হয়—কিন্তু কায়মনোবাক্যে দুরাচারী হয় তাহলে তাকে আলো থেকে অন্ধকারের যাত্রী বলা হয়।

আর যে মানুষ ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করে সদা সর্বদা সদ্ আচরণের সাধনা করে থাকে তাকে আলো থেকে আলোর পথের পথিক বলে মনে করি।"

।। চিত্রকথা ।। মহাবলী ।। ৪

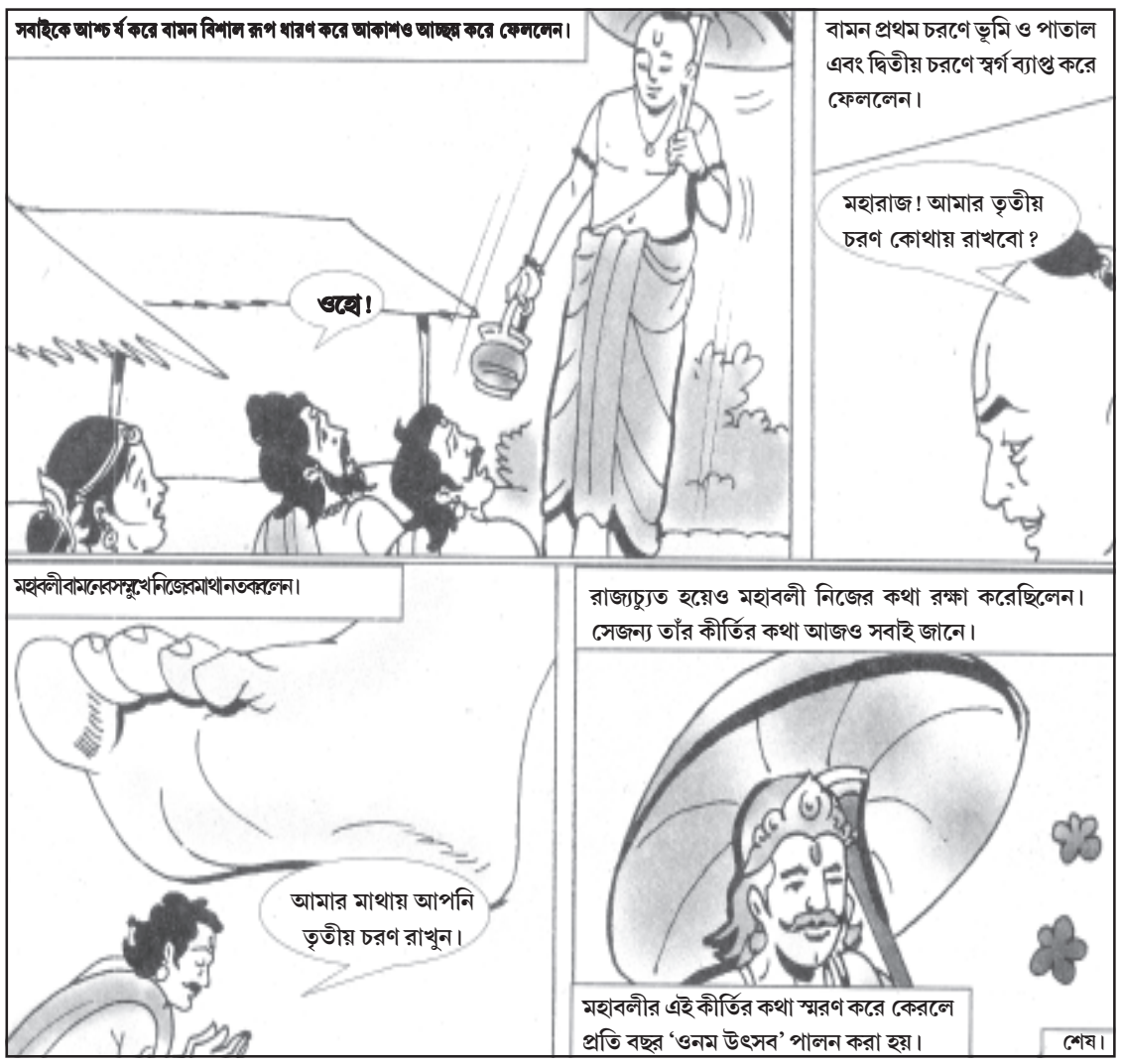

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

জরাকে ঠেকাতে

জন্ম ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৯। বয়স ৫০। হিসেবে ভুল মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে এটাই হয়ে উঠতে পারে ঠিক হিসেব। বৃটেনের লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা একটি গবেষণা চালাচ্ছেন, যার লক্ষ্য ফিফ্‌টি অ্যাকটিভ আফ্‌টার ফিফ্‌টি। মানুষের দেহে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পালটে দিয়ে জরাকে আটকাতে চান তাঁরা। কৃত্রিম হাঁটু, কৃত্রিম নিতম্ব, হৃদ্‌যন্ত্রের নতুন ভাল্‌ভ বদল দিয়ে শুরু। এরপর অন্যান্য অঙ্গও বদলানো হবে। এই নতুন দেহ নিয়ে মানুষ একশো বছর অবধি দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবে,—পঞ্চাশে দেহ যেমনটি থাকে, তেমনটি।

মোবাইল চার্জারের দিন ফুরোল

মোবাইল চার্জারের দিন কি ফুরোল? অসমের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী অমিতা। রেখা বোরা এরকমই একটি সম্ভাবনা দেখিয়েছে। গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানের ছাত্রী অমিতা তৈরি করেছে একটি অটো চার্জারের মডেল। এতে হ্যান্ডসেটের উষ্ণ বিকিরণই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ফেরৎ যাচ্ছে ব্যাটারিতে। ফলে পরিবেশ দূষণও কম হচ্ছে। টেট্রা জিঙ্ক অক্সাইডের তার ও এনকো চিপ দিয়ে মডেলটি বানাতে খরচ হয় ৮০০ টাকা। এটি চেন্নাইয়ে জওহরলাল নেহরু বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে পুরস্কারও পেয়েছে।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় বডি-স্ক্যানার

সন্ত্রাস মোকাবিলায় এবার ম্যাঞ্চেস্টার বিমানবন্দরে বসল নতুন বডি-স্ক্যানার। শুধু অস্ত্রশস্ত্রই নয়, ওই মেশিনে ধরা পড়বে গোটা শরীরের ছবিও। কৃত্রিম হাত-পা থেকে শুরু করে শরীরের প্রতিটি অঙ্গই ধরা পড়বে এক্সরেতে। বৃটেনের এক সংবাদপত্র জানিয়েছে, বুথে দাঁড় করিয়ে প্রতিটি যাত্রীর শরীর পরীক্ষা করা হবে ওই যন্ত্রে। এর থেকেই প্রতিফলিত হবে যাত্রীর শরীরের নগ্ন ত্রিমাত্রিক ছবি। এর জন্য জুতো, কোট, বেল্ট খোলার প্রয়োজন হবে না। সাদা কালো ওই ছবিটি দেখতে পাবেন শুধুমাত্র একজন অফিসার, পরে সে ছবি মুছে ফেলা যাবে।

গর্ভেই শিশুর মাতৃভাষা

মাতৃগর্ভে শিশুরা মাতৃভাষায় কাঁদে। জার্মানির কয়েকজন গবেষক দীর্ঘদিনের গবেষণায় দেখেছেন, মাতৃগর্ভেই শিশুর চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যায় নিজের ভাষা। গর্ভেই সে ক্রমশ আয়ত্ত করতে থাকে মায়ের ভাষা। ভাষার সঙ্গে যে নাড়ির টান থাকে তা এবার একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হল ইউনিভার্সিটি অফ উজবার্গ-এর গবেষণায়। অধ্যাপক ডঃ ক্যাথলিন ওয়েরম্যাকের নেতৃত্বে একদল গবেষক তিরিশ জন জার্মান ও ফরাসি গর্ভস্থ শিশুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, দুই ভাষাভাষী মায়েদের গর্ভস্থ শিশুদের কান্নার ধ্বনি নিজস্ব মাতৃভাষার।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

স্বামী—নতুন ড্রাইভারটাকে আজ বিদেয় করে দেব।

স্ত্রী—কেন, সে আবার কী করল?

স্বামী—দু'দিনে অন্তত চারবার আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

স্ত্রী—আহা, বেচারাকে আর একটা চান্স দাও না!

* * *

শিক্ষক—এমন একটা পর্বতের নাম করতে পারবি, যার সঙ্গে ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে আছে?

ছাত্র—হ্যাঁ স্যার, দাদাগিরি।

* * *

—ডাক্তারবাবু, হাসির কথা না হলেও আমার ছেলে কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ছেলেকে নিয়ে বড্ড চিন্তায় আছি।

—চিন্তার কিছু নেই। দেখবেন, বড় হয়ে আপনার ছেলে টিভি চ্যানেলের কমেডি শো-এর বিচারক হবে।

* * *

সঞ্জু—কীরে, এখনও মুক্তির সঙ্গে ঘুরছিস?

রঞ্জু—না তো!

সঞ্জু—কী করে কাটালি?

রঞ্জু—বিয়ে করে।

* * *

দামী গাড়িতে প্রেমিক—তোমায় মিথ্যে বলেছি, আমি ম্যারেড।

প্রেমিকা—ভাগ্যিস বলনি গাড়িটা তোমার নয়।

—নীলাদ্রি

মগজ চর্চা

১। কোন্ দেশের সংবিধান রয়েছে, কিন্তু তা লিখিত আকারে নেই?

২। প্রথম অভিনীত ছবি 'ইন্টারভিউ'তে অভিনয় করে কোন্ অভিনেতা কার্লোভি ভ্যারি ফিল্ম্ ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান?

৩। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে?

৪। ডাইনোসরকে নিয়ে লেখা স্যার আর্থার কনান ডয়েল-এর উপন্যাসের নাম কী?

৫। ১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকার ভারতে প্রথম যে আয়কর চালু করে, তাকে কী বলা হত?

—নীলাদ্রি

উত্তর:

১। ব্রিটেন

২। রঞ্জিত মল্লিক

৩। রেভারেন্ড জেমস লং

৪। দি লস্ট ওয়ার্ল্ড

৫। জেমস উইলসন

বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন রাষ্ট্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা

জিনের রূপান্তর ঘটিয়ে বিটি বেগুন নামে একধরনের কীটনাশক বেগুন বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর এই সরকারী মদতপুষ্ট সর্বনাশা খেলায় সীলমোহর বসাতে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ 'গণশুনানি'র কথা ঘোষণা করেন। এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে সারা দেশে। কি এই বিটি বেগুন? এই বেগুন চাষে কেন আগ্রহী সরকার? ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন সর্বনাশটা লুকিয়ে আছে এর মধ্যে? উত্তর মিলবে আলোচ্য নিবন্ধটিতে।

এন সি দে

কেন্দ্রের কংগ্রেস-জোট সরকার লোকসভা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা জনগণকে খাদ্য-বিষয়ে নিরাপত্তা দিতে ক্ষমতায় বসেই খাদ্য-নিরাপত্তা আইন পাশ করাবে। ৯০ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার যেমন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, খাদ্য নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতিটিও তেমনি শিকেয় উঠেছে। শুধু তাই নয়, যে কংগ্রেস সরকার জনগণকে খাদ্য-নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই কংগ্রেস সরকার একটি আমেরিকান কোম্পানীর চাপে বিটি-বেগুন নামক একটি বিষ-বেগুনের চাষের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। বিটি-বেগুন কী? এর চাষ কিভাবে জাতীয় জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে অনবে? আসুন সেই বিষয়ে একটু চর্চা করি।

বিটি কথাটি এসেছে ব্যাকটিরিয়াম ব্যসিলাস থুরিংজিয়েনসিস কথাটি থেকে। এটি বিটি বেগুনের বীজ তৈরির মাটি। এই মাটির মধ্যে বেগুনের জিনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন একটি যৌগিক জিনের রূপান্তর ঘটানো হয় যা আদতে কীটনাশক। জিনের রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে বেগুন সৃষ্টি হয় তা নিজেই একটি কীটনাশকে পরিণত হয় যেটি ওই ব্যাকটিরিয়া মিশ্রিত ব্যাসিলাস থুরিংজিয়েনসিস মাটি থেকে সৃষ্ট। সেই কারণে এই বীজে তৈরি গাছ কিংবা বেগুন কখনও পোকায় কাটতে পারে না।

এই বীজ তৈরি করেছে মূলত 'মনস্যানটো' নামক একটি আমেরিকান কোম্পানী। ভারতে এই বীজ থেকে বেগুন উৎপাদন চালু করার লাইসেন্স তারা দিয়েছে মহারাষ্ট্র হা্ইব্রীড সিড্স্ কোম্পানী লিমিটেড (MHSCO) নামক একটি দেশীয় কোম্পানীকে, যাদের কর্মকাণ্ড চলছে কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে। স্পষ্টতঃই উদ্দেশ্য রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে এই বিষময় খাদ্য শস্যের চাষ দেশে শুরু করা।

কিন্তু চুপিসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দালালি করতে গিয়েও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের স্বদেশ প্রেমিক বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী ব্রিগেডের দৌলতে সারা পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বহু রাজ্যে এই মারণ চাষের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হওয়ায় অন্যান্য দেশে এবং আমাদের দেশের অনেক রাজ্যে ইতিমধ্যে এই চাষ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন কেরল, ওড়িশা, তামিলনাড়ু,

ছত্তিসগড় এবং উত্তরাখণ্ড। কেরলের কমিউনিস্ট সরকার পিছিয়ে এলেও, পশ্চিমবঙ্গের আগমার্কা কমিউনিস্ট সরকার কিন্তু এখনও এই চাষ নিষিদ্ধ করতে টালবাহানা করছে। মমতার দল তো কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের 'বি-টিম'। তাই এই নিয়ে তার দলের কোন দায় নেই। বি জে পি'-র উচিৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধ্য করা এই মারণ-চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে।

এই কৃত্রিম খাদ্যশস্য উৎপাদনের বায়োটেকনোলজির নয়া মানবনিধনের বিরুদ্ধে জনমতের চাপে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ এনভায়র্নমেন্ট এ্যান্ড ফরেস্টস্ গঠন করতে বাধ্য হয়েছে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি ছগুড্রট্রগ্ন। এই কমিটির কাছেই মার্কিন কোম্পানীর ভারতীয় দালাল কোম্পানী তগুড্রত্রট্রখ এই চাষের অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করেছিল। গুড্রট্ট্র যাতে মানবস্বাস্থ্য ও সমাজের প্রতি এই চাষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে সহজেই এই অনুমোদন দিয়ে না দেয়, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। এর মধ্যে রয়েছে 'গ্রীনপীস' নামক খ্যাতনামা সংগঠনটিও।

এরা মূলত বিটি কটন (কৃত্রিম তুলা) চাষে চাষীদের স্বাস্থ্যের উপর এই মারণ চাষের বিরূপ প্রভাবের বিভিন্ন তথ্য পেশ করে দেখায় তুলা চাষীরা চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং গবাদি পশু বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারাচ্ছে। এদের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে GEAC-কে নির্দেশ দেয় যতক্ষণ না পুনরায় আদেশ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ যেন এই চাষের অনুমোদন দেওয়া না হয়। সুপ্রিম কোর্ট সাথে সাথে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, হায়দরাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ পুষ্প এম. ভার্গবকে GEAC পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি ঘটনা হলো সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮-এর প্রথম দিকে এই বিষময় চাষের অনুমতি দিয়ে দেয়। তার ভিত্তিতে GEAC-তে অক্টোবর '০৯-এ এই চাষকে ব্যবসায়িক অনুমোদন দিয়ে দেয়। যদিও ডঃ ভার্গব মন্ত্রককে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তাঁর এবং আরো দুজন সদস্যের দ্বিমতের কোনও মূল্যই কমিটিতে দেওয়া হয়নি।

অনেক বুদ্ধিজীবী এই অনুমোদনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস-জোট সরকার দূষণমুক্ত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে মানুষকে। কিন্তু এই বিষ চাষের অধিকার মার্কিনীদের হাতে তুলে দিয়ে এ কোন্ ভারত গড়ার ইঙ্গিত দিল ভবিষ্যতই বলতে পারে।

তেজস্ক্রিয় দূষণের সূতিকাগার

(৮ পাতার পর)

সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকোঠারী সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হন এবং বাকি জীবন দেশ বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কাটিয়ে ১৯৭৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় মারা যান। তার মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

মনে রাখা প্রয়োজন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি অত্যন্ত দুর্ঘটনা প্রবল। ছোটখাট দুর্ঘটনা এখনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পারমাণবিক রি-অ্যাক্টারে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ফিসন পদ্ধতিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাপ উৎপাদন করে। সেই তাপ গিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই ইউরেনিয়াম ২৩৫ এর কণা ভেঙে যাওয়ার পর বেরিয়ে এসে তার তেজস্ক্রিয়তা প্রচণ্ড অনর্থ সৃষ্টি করে। পরিশোধিত ইউরেনিয়মকে চুল্লিতে ঢোকানোর জন্য একটা লাঠির আকার দেওয়া হয়। একেকটি লাঠি চুল্লিতে তিন বছর পর্যন্ত জ্বলে। এরপর লাঠিগুলিকে বের করে ফেলা হয়। জ্বলে যাওয়া ইউরোনিয়মে থাকে কিছুটা ইউরেনিয়াম আর থাকে স্টুনটিয়াম ৯০, কেইসিয়াম ১৩৭ এবং প্লুটোনিয়াম-২৪২। প্লুটোনিয়াম প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। মানুষ পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করতে গিয়ে এর জন্ম দিয়েছে। প্লুটোনিয়ামের অর্ধজীবন ৩৮০,০০০ বছর। আর ১ গ্রাম প্লুটোনিয়ামের দশলক্ষ ভাগের একভাগ একটি মানুষের ক্যানসারের কারণ হতে পারে। প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা এতটাই মারাত্মক। আজকের উন্নয়নের যুগে আরও সমস্যা হলো পারমাণবিক চুল্লীর বর্জ্যকে নিরাপদে রাখার প্রযুক্তি এখনও আবিষ্কার হয়নি। বর্জ্য রাখার জন্য রাশিয়া ও আমেরিকা দু দেশেই ভয়াবহ বিপদ ঘটেছে। পরমাণু বিদ্যুৎ মানুষের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। কিন্তু যতদিন না এর বর্জ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে ততদিন এটা গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই পশ্চিমের দেশগুলো অনেক আগেই এই প্রযুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৮০ সালে সুইডেনের নাগরিকেরা ২০১০-এর মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক চুল্লী বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকা এই প্রকল্প বাতিল করেছে। ফলে এই প্রকল্পে আর কারও আগ্রহ নেই। তবে আমাদের দেশেই বা কেন?

সারা বিশ্বে উন্নতিশীল দেশগুলিতে যখন এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নিজেদের ঝড়তি পড়তি মালপত্র জলের দরে বিক্রি করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে চাইছেন।

আমাদের দেশের কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার অনেক কম দামে মালপত্র পেয়ে দেশের মানুষকে ধ্বংস করতে উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। সরকার বলছেন, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে গাঁয়ের মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু সকলেই জানেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, তাই কি করে প্রচুর গাঁয়ের লোকের কর্মসংস্থান হবে তা বোধগম্য নয়। হরিপুরে বিদেশি প্রযুক্তি অর্থাৎ ফেলে দেওয়া বিদেশি প্রযুক্তি বিক্রির জন্য এক বিদেশী ধর্মগুরুকে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমেরিকার মিশিগান থেকে ক্যাথলিক যাজক চার্লস পিটার ডগহার্টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রচারের উদ্দেশে প্রচারে হরিপুরে গিয়েছিলেন। কেন এই প্রচার? তা কি কেবল মুনাফার জন্য? সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চাইছে নানাভাবে যুবশক্তিকে পঙ্গু করতে। মালদা মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা, দার্জিলিং কামতাপুরি প্রভৃতিকে মদত এবং সবশেষে পূর্ব-মেদিনীপুরকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা।

পূর্বমেদিনীপুর হচ্ছে জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার। এই জেলার মানুষই স্বাধীনতা দিবসে সব থেকে বেশী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্ষুদিরাম দেশের প্রথম শহীদ। জাতীয়তাবাদের পীঠস্থান এই জেলাই নন্দীগ্রামে বিদেশীশক্তি সালিম গোষ্ঠীকে রুখে দিয়েছে। তাই আরও বড় আঘাত করার জন্য একদিকে নয়াচর ও অন্যদিকে হরিপুর।

শব্দরূপ - ৫৩৩

মল্লিকা বাগচি

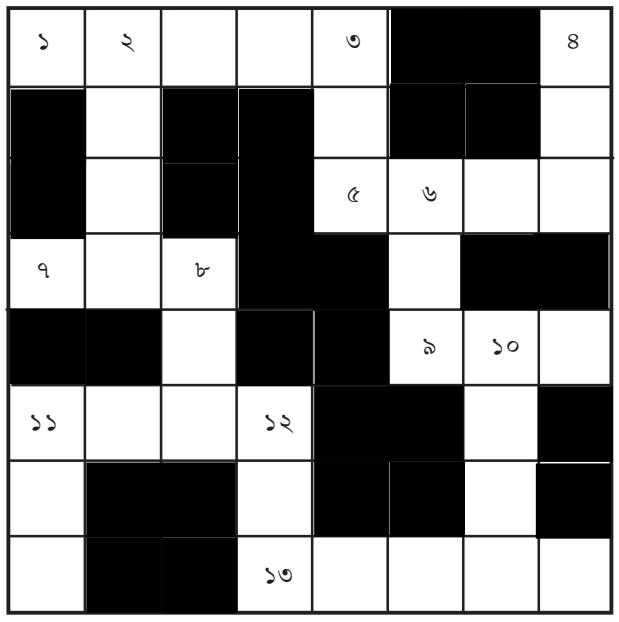

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শ্রীকৃষ্ণ, দু'য়ে-তিনে প্রণালী, ৫. রাজসিংহাসন, একে-তিনে হৃদয়, ৭. রাধিকার এক সখী, একে-তিনে বল্লরি, ৯. ক্ষুদ্র লতা, প্রথম দু'য়ে কানের নরম অংশ, ১১. শিবের রুদ্ররূপ, ১৩. অস্থিমালারী শিব, একে-তিনে যন্ত্র, চারে জননী।

উপর-নীচ ঃ ২. দেশি শব্দে ক্ষুদ্র জলস্রোত, একে-দুয়ে শূন্য, ৩. বিশেষণে গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, ৪. পুরাণোক্ত হিরণ্যকশিপুর পুত্র, ৬. তৎসম শব্দে জল, বারি, ৮. রামচন্দ্রের হাতে নিহত রাক্ষসী-বিশেষ, ১০. সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর বধের জন্য এই স্বর্গসুন্দরীর সৃষ্টি হয়েছে, ১১. রামায়ণের কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী, ১২. তৎসম শব্দে আলতা, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, আগাগোড়া ইঙ্গ তালা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩১

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
শান্তনু গুড়িয়া,
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩

র	■	ল	হ	র	■	জ	■
স	■	ব	■	ক্ষ	ত্রি	য়	■
না	র	ঙ্গ	■	ক	■	ঢা	■
য়	■	■	■	■	র	ক	ম
ক	ম	লা	■	■	■	■	ঙ্গ
■	ন্দা	■	প	■	র	সা	ল
■	কি	ন্ন	র	■	ট	■	চ
■	নী	■	ব	স	ন্তী	■	ণ্ডী

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩২

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	আ	কা	শ	বি	হা	রী
অ	ঘো	র	■	■	■	স	■
ট	■	তি	ল	ক	■	নু	■
ল	ব	■	■	থ্ব	■	হা	■
■	ষ	■	স	■	■	না	গ
■	র্ট	■	তী	ব	র	■	ণ
■	কা	■	■	■	জ	ন	ক
ক	র	ত	ল	গ	ত	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ সংখ্যায়

শতবর্ষ পেরিয়ে

আকাশবাণীতে গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৭৫)

রঙ্গম

বিকাশ ভট্টাচার্য।। সালটা ১৯৭২। এই প্রতিবেদক তখন সদ্য তিরিশ এক যুবক। আজকের মত বাংলা রাগপ্রধান গান তখন এতটা জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু কানে বাজছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর 'ওই এল ফাগুন' (কাফি), বসন্তরাগে নিবদ্ধ 'অলি গুঞ্জরি কয় জাগো'। অন্যদিকে রামকেলিতে 'জাগো অলক লগনে', ভৈরবীতে বাঁধা 'নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো'—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মনকাড়া গান। ঐ সময়েই কানে আসছে 'খোল খোল মন্দির দ্বার' বা 'আমার ঝরা ফুলের এই মালাটি'—তারাপদ চক্রবর্তীর গান। মেগাফোন থেকে প্রকাশিত এইসব রাগপ্রধান গান শুনে ঠিক করেছিলাম বাংলা রাগপ্রধান গানের অনুষ্ঠান করবো। রবীন্দ্রসদনে। জ্ঞান গোঁসাই নেই। ভীষ্মদেব অসুস্থ, থেকেও নেই। ছুটে গেলাম তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। পুত্র মানস চক্রবর্তীর কাছে পিতৃ পরিচয় দেওয়ায় সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া গেল। একটা চৌকির ওপর অসুস্থ শিল্পী আধশোওয়া অবস্থায়। এককালের কন্দর্পকান্তি শিল্পীর অস্থিচর্মসার চেহারা দেখে চোখে জল এসেছিল সেদিন। শুধুমাত্র বাংলা রাগপ্রধান গানের তিনঘণ্টার অনুষ্ঠান করবো শুনে তিনি আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। কথায় কথায় সেদিন শিল্পী তাঁর অভিমানের কথা বলেছিলেন। তিনি আকাশবাণীতে বাংলা খেয়াল গাইতে চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ রাজি না হওয়ায় তিনি আকাশবাণীতে গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

তারাপদ চক্রবর্তী

বাংলার মতো এমন সমৃদ্ধ ভাষায় কেন খেয়াল গাওয়া যাবে না? এই অভিমান নিয়ে আর বছর তিনেক পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের বাংলা রাগপ্রধান গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। শিল্পী ছিলেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিলবন্ধু ঘোষ। সাথ সঙ্গ তে ছিলেন কেরামতুল্লা ও সাগীরুদ্দিন।

সম্প্রতি ২৮শে নভেম্বর ২০০৯ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই প্রবাদ প্রতিম শিল্পীর জন্মশতবর্ষ উৎসব শুরু হল নজরুল মঞ্চে । সারারাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রথিতযশা শিল্পীরা সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন। ৫ ও ৬ই ডিসেম্বরও অনুষ্ঠান হল রবীন্দ্রসদনে। তারাপদ চক্রবর্তী 'নাকুবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রথমে পিতা পরে সাতকড়ি মালাকার, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেন। খুব ভালো তবলা বাজাতেন। রাইচাঁদ বড়ালের সহায়তায় আকাশবাণীতে তবলাবাদকের চাকরী নেন। একদিন নির্দ্ধারিত সঙ্গীত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে বেতারে গান গাইতে হয়। সেই প্রথম বেতারে গেয়েই শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন তিনি। শুরু হল তাঁর গায়কের জীবন। তিনিই বাংলা ভাষায় খেয়াল ও ঠুংরী গানের প্রবর্তক। 'সঙ্গীতাচার্য', 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রভৃতি বহু সম্মানে তিনি সম্মানিত। তিনি তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত রসিকদের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ৩২টি মূল্যবান ছবি এবং তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আলি আকবরখান, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পুত্র পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ সহ একটি মূল্যবান জন্মশতবার্ষিকী সংকলন "সেই স্মৃতি সেই গান" নজরুল মঞ্চে সেদিন লোকার্পিত হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাল-সেকাল

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

একালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ প্রাঙ্গণ।

একালে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে।

সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবটি এককালে শহরের অন্যতম সেরা উৎসব বলে গণ্য হতো। কর্মচারীদের মধ্যেও একটা সাজসাজ রব পড়ে যেত। দু'তিন দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলত ঢাকুরিয়া লেকের (বর্তমান রবীন্দ্র সরোবর) মাঠে। উৎসব সুসম্পন্ন হলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত।

পড়াশোনা ও পরীক্ষায় সাফল্য এবং পারদর্শিতা তথা কৃতিত্বের চিহ্নস্বরূপ ছাত্রগণ দু'হাত ভরে পদক-পুরস্কার নিয়ে উজ্জ্বল মুখে ঘরে ফিরত। সমাবর্তনে উপস্থিত বিদ্যোৎসাহী জনতা হাত তালি দিয়ে ছাত্র-গবেষকদের অভিনন্দন জানাত। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের অজুহাতে যেদিন থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রদানের প্রথা বাতিল হলো, সেদিন থেকে সমাবর্তন উৎসবের মূল আকর্ষণই হারিয়ে গেল, একটা নিষ্প্রাণ ম্যাড়ম্যাড়ে বার্ষিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হলো বার্ষিক সমাবর্তন।

নয় বৎসর পূর্বেকার আচার্য ও উপাচার্যের সমাবর্তন ভাষণের কপি হঠাৎ হাতে পড়ল। তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় অবস্থার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। পদক পুরস্কারের প্রসঙ্গটাই আগে বলে নিই। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পদক নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণায় উৎসাহদানে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক ও পুরস্কার দানের জন্য প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অজস্র অর্থ দান করেন। তাঁদের প্রদত্ত অর্থের উপস্বত্ব থেকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে ভর্তুকি দিয়েও পদক ও পুরস্কার দাতাদের শর্ত রক্ষা করা হোত। বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম আর্থিক সংকটকালে বিশ্ববিদ্যালয় তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালনে বিচ্যুত হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য ছিল;কিন্তু দৈন্যাবস্থা ছিল না। বর্তমানকালে বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ থাকলেও শিক্ষা ও গবেষণার গর্ব ও মর্যাদার প্রতীক সেসব পদক পুরস্কার ও বক্তৃতামালা কার্যত লোপ পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুসারে দেখা যাচ্ছে বৎসরে বিভিন্ন বিষয়ে ৪০০-র বেশি পদক পুরস্কার দেবার কথা। কিন্তু এ বৎসরের সমাবর্তনে মাত্র ১৯টি পদক দেওয়া হয়েছে। বৎসরে ৫০টির অধিক বক্তৃতামালার মধ্যে মাত্র ১৩টি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হয়েছে। শতাধিক স্টুডেনশিপ/ফেলোশিপ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ দেখা গেল না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল একদা ভারতখ্যাত, এমন কী বিশ্বখ্যাত টেগোর ল' লেকচারশিপ, কমলা লেকচারশিপ, স্টেফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতামালা, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, জগত্তারিণী পদক, গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ, স্যার আশুতোষ মেডাল, ঈশান স্কলারশিপ ইত্যাদি ঐতিহ্যশালী ও মর্যাদাপূর্ণ পদক / পুরস্কার / বৃত্তি / বক্তৃতামালার কোনও উল্লেখ দেখা গেল না সমাবর্তন ভাষণে।

পি. এইচ. ডি. গবেষণাপত্র পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশে অনেকে অনুযোগ করে থাকেন। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন প্রাচীনকাল থেকেই যে একটু কড়া ধরনের তা অস্বীকার করার উপায় নেই। থিসিস দাখিল থেকে পরীক্ষক নিয়োগ, থিসিস প্রেরণ, দেশি ও বিদেশি পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন রিপোর্ট আনয়ন, পরীক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে থিসিস সংশোধন, পরীক্ষকদের সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী দান পর্যন্ত যথেষ্ট কঠোরতা ও গোপনতা রক্ষা করা হয় বলে কোনকোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছ'মাসে-ন'মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি পাওয়া যায় না। তবে শতকরা নববুইটি ক্ষেত্রেই থিসিস অনুমোদনে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে না। তা না হলে বছরে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি পায় কি করে? কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সারা বিশ্ব ঢুঁড়েও পরীক্ষক পাওয়া যায়নি। একেরপর এক পরীক্ষক থিসিস পরীক্ষা করতে অস্বীকার করছে। এসব ক্ষেত্রে তিন চার বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু এরকম দুর্ভাগ্য নগণ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যেই ঘটে।

এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রসঙ্গ। কেউ যদি কলেজস্ট্রীট ক্যাম্পাসে (বর্তমানে আশুতোষ প্রাঙ্গণ) এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ বুঝতে চান, তাহলে তিনি ভুল করবেন। তবে আশুতোষ বিল্ডিং-এর ভেতর দিয়ে দিনেরবেলা হাঁটলেও তাকে ভূতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হবে। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা কলেজস্ট্রীট ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। অল্পসংখ্যক কেরানী পরীক্ষার্থীদের নামধাম, পরীক্ষাকেন্দ্র প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো, পাসের তালিকা প্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি কাজ নীরবে করে যেত। ১৯০৬ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে এলে রাতারাতি যেন যাদুকরের স্পর্শে ঘুমন্তপুরী আচমকা জেগে উঠল। "সিনেট হলে সেদিন পাগড়ী, ফেজ, হ্যাট, টুপি, নেক্‌টাইয়ের সঙ্গে শিখা-ত্রিপুন্ডক-তিলক-উত্তরীয়-উপবীতের নয়ন-বিমোহন শোভায় শোভিত হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যার আদান-প্রদানরত গুরু-শিষ্যমণ্ডলীর ঐক্যতানে অধুনা বিধবস্ত সৌধটি গৃহবলিভূক বায়স সমাকুল চৈত্যবৃক্ষের মতো মুখরিত হয়ে উঠত।" বেলা ১১-টার ঘণ্টা পড়তেই ছাত্রদের কলকোলাহল থেমে যেত। ঘরে ঘরে শুরু হতো পঠনপাঠন। অধ্যাপকদের সরু মোটা মিহি কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসত দরজাজানালা ভেদ করে। একদিকে আর্টস কলেজের ঢং ঢং ঘণ্টা ধ্বনি, ল' কলেজের ক্রি-ই-ই-ই-ং বিদ্যুৎ বেলের সুরেলা রব, এবং সে সঙ্গে ভেসে এসে মিলিত হতো হেয়ারস্কুল, হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ঠন্ ঠন্ ঢং ঢং বেল পেটানোর শব্দ। তার সঙ্গে যুক্ত হতো অধুনা বিলুপ্ত সেনেট হলের খোপরে খোপরে স্থায়ীভাবে বসবাসরত পারাবত কুলের এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি অবিরাম উড়াউড়ি এবং অধ্যাপকদের অনুকরণে অবিশ্রাম বকবকম ধ্বনিতে সমগ্র প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তোলা। আর সেনেট হল, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, হার্ডিঞ্জ হোস্টেল ও আশুতোষ বিল্ডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে বসে স্বল্প মাইনের কেরানিকুল নিবিষ্ট মনে করে যেত পরীক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্ম। মোট কথা শিক্ষা ও শিক্ষামূলক কাজকর্ম নিয়ে গোটা প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করত।

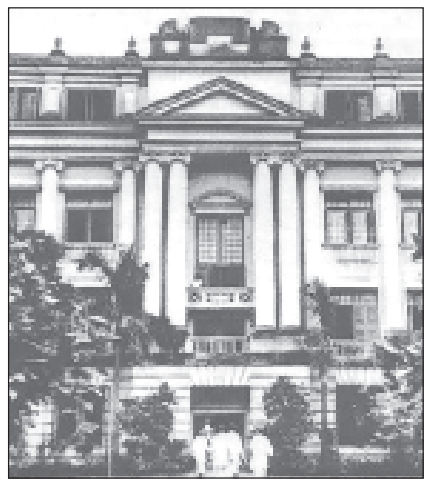

সেকালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু এখন সে ক্যাম্পাসের হতশ্রী অবস্থা। একটি ভেঙ্গে আটটি ক্যাম্পাস হয়েছে। কলেজস্ট্রীট ক্যাম্পাস থেকে দু'চারটি ভাষা বিভাগছাড়া প্রায় সমস্ত শিক্ষা বিভাগ অন্যত্র সরে গেছে, যার ফলে কলা বিভাগের মূল কেন্দ্র আশুতোষ বিল্ডিং পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। শিক্ষকদের যে কমনরুমটি সব সময় আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কে গমগম করত, তা নীরব এবং সুপ্তিমগ্ন মনে হয়। ওই ঘরটির চারদেয়ালে প্রয়াত ও অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপকদের সারি সারি ফটো, আর নিচে সারি সারি শূন্য চেয়ার— করুণ দৃশ্যই বটে। আসন পড়ে আছে;বসার লোক নেই। কারণ বিভাগগুলি স্থানান্তরিত হবার ফলে শিক্ষক মশাইরাও নতুন কর্মস্থলে পাড়ি দিয়েছেন, এ বাড়ির বুক শূন্য করে। ফলে ভূতুড়ে বাড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সত্যি কথা বলতে কি পুরো ক্যাম্পাসটিই এখন প্রায় অফিস পাড়ায় পর্যবসিত। ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের যখন তখন বিক্ষোভ, সমাবেশ, ধর্না, মিছিল, স্লোগানেই ক্যাম্পাসে কিছুটা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। তবে এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলা সমীচীন হবে না, কারণ সেটা রাজনীতি;এবং পরিত্যজ্য।

Swastika
11 January - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT